যাত্রা হ'ল শুরু

অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

প্রাচী পাব্লিশার্স

৮ডি, দমদম রোড

কলিকাতা-৩০

প্রথম সংস্করণ : অগ্রহায়ণ, ১৩৬১

প্রকাশক :
শ্রীরবীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়
৮ ডি, দমদম রোড, কলিকাতা-৩০

পরিবেশক :
বামা পুস্তকালয়
১১ এ, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২

মুদ্রাকর :
শ্রীমুরারিমোহন কুমার
শতাব্দী প্রেস লিমিটেড
৮০, লোয়ার সার্কুলার রোড
কলিকাতা—১৪

প্রচ্ছদপট :
শ্রীসিদ্ধেশ্বর মিত্র

মূল্য :
আড়াই টাকা

পরম পূজনীয় গুরুদেব

সত্যর্ষি শ্রীমৎ যোগজীবনানন্দ স্বামীর

শ্রীচরণে

ভক্তিপ্রণত অমর

এই লেখকের লেখা :—

পূর্ব্বাপর	(গল্প)
অন্তরীক্ষ	(উপন্যাস)
চলচ্ছায়া	(গল্প)
রঙ্গমঞ্চ	(নাটক)
বিয়োগান্ত	(গল্প)
অলিভার টুইষ্ট্	(শিশুপাঠ্য)
উড়োজাহাজ	(শিশুপাঠ্য)

॥ প্রকাশিতব্য ॥

হে মহাজীবন

(বহু জীবনের বহু বিচিত্র চিত্র)

॥ যাত্রারম্ভ

উদয়াচলে আরক্ত আভা। সূর্য্য উঠছে। দিনের যাত্রা শুরু হল।

প্রসন্নমনে প্রিয়নাথবাবু তাঁর দৈনন্দিন দাতব্য আরম্ভ করলেন। ওষুধ দিলেন রুগীদের, পথ্যের জন্যে পয়সা দিলেন, গরীব ছাত্রকে দিলেন স্কুলের মাহিনা, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে ভোজ্য।

ঘণ্টাখানেক ধরে চলল তাঁর এই ব্যসন। প্রতিদিনের কাজ। এ কাজে ভারী আনন্দ প্রিয়নাথবাবুর।

শান্তির সংসার। শোক পেয়েছেন, তবে সে-আঘাত তাঁকে মুহ্যমান বিমূঢ় করে রাখতে পারেনি। বৃহৎ শোকের ভিতর দিয়ে তিনি খুঁজে পেয়েছেন বৃহত্তর সার্থকতার পথ। কিছুদিন আগে সহধর্ম্মিণী ব্রজেশ্বরী ইহলোক ত্যাগ করেছেন। সেই থেকে প্রিয়নাথের অন্তরে ফল্গুধারার মত বৈরাগ্যের একটি স্রোত প্রবাহিত হচ্ছে। ইচ্ছা করেছেন ছেলেকে সংসারে প্রতিষ্ঠিত করে দীর্ঘ দিনের জন্যে তীর্থ পর্য্যটনে বার হবেন।

একটি মাত্র সন্তান পুত্র সুপ্রিয়। চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্সী পাশ ক'রে নাম-করা হিসাব-রক্ষকের আপিসে শিক্ষানবিশী করছে। প্রিয়-নাথের ইচ্ছা আছে ছেলেকে বিলাত ঘুরিয়ে এনে নিজস্ব আপিস খোলবার ব্যবস্থা করে দেবেন।

পুত্রের বিবাহের ব্যাপারটাও স্থির করা আছে। বন্ধু ভবতারণ চক্রবর্ত্তীর কন্যা প্রমীলার সঙ্গে তার বিবাহ দেবেন মনস্থ করে রেখেছেন।

ভবতারণ ধানবাদের এক কয়লাখনিতে ম্যানেজাররূপে কাজ

করতেন। কিছুদিন আগে বাত-ব্যাধিতে অশক্ত হয়ে পড়েন। বন্ধুর সংবাদ পাবা মাত্র প্রিয়নাথ পরম যত্নে ও সমাদরে ভবতারণকে কলকাতায় আনবার ব্যবস্থা করেন এবং তাঁর বাড়ীর পাশে তাঁর বাসস্থান ঠিক করে দেন। ভবতারণ বর্ত্তমানে কন্যাকে নিয়ে সেই বাসাতেই আছেন। প্রিয়নাথ প্রত্যহ সন্ধ্যায় বন্ধুর কাছে গিয়ে গল্প-গুজব করে আসেন। ভবতারণও বিপত্নীক।

সুপ্রিয় আর প্রমীলা উভয়েই তাদের আসন্ন বিবাহের কথা জানে। উভয়ের মধ্যে বহুদিন থেকেই একটি শান্ত-স্নিগ্ধ প্রীতির সম্বন্ধ গড়ে উঠেছে।

বড়বাজারের প্রান্তে প্রিয়নাথের বড় কারবার অনেক দিনের। জুট, হেসিয়ান ও আমদানি-রপ্তানির কাজে প্রিয়নাথের দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা সামান্য নয়। সরল ঋজু পথেই তিনি চিরদিন কারবার চালিয়ে এসেছেন। ভাগ্যলক্ষ্মীর কৃপণতা ছিল না। অর্থ, প্রতিপত্তি ও যশ প্রিয়নাথ পর্য্যাপ্ত পরিমাণেই পেয়েছেন।

সম্প্রতি যে কাজে তিনি নিজেকে সব চেয়ে বেশী মগ্ন রেখেছেন তা হচ্ছে স্ত্রীর নামে একটি সেবাসদন নির্ম্মাণ। শহরের এক স্থানে কিছুটা জমি তাঁর ছিল। সে-জমি তিনি হাসপাতালের জন্যে দান করেছেন। বাড়ী তৈয়ারীর কাজ শুরু হয়েছে। পল্লীর কয়েকজন উৎসাহী নাগরিক তাঁর কাজে সহায়তা করছেন।

রুগী ও প্রার্থীর দল চ'লে গেলে প্রিয়নাথ কাগজ-পত্র নিয়ে বসলেন। টেবিলের সামনে দেওয়ালের গায়ে স্ত্রীর একটি প্রকাণ্ড অয়েল-

পোর্ট্রেট টাঙানো। সেই ছবির স্মিত-হাস্য-স্ফুরিত মুখের পানে বারেক তাকালেন। তারপর একটা মোটা খাতা টেনে নিয়ে বোধ করি খরচ-পত্রের হিসাব লিখতে লাগলেন।

—আছেন নাকি? ব'লে এক ব্যক্তি ঘরে ঢুকে নমস্কার জ্ঞাপন করলেন।

—আসুন, আসুন, পরেশ বাবু! আপনার জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম। বসুন!

পরেশবাবু ব্রজেশ্বরী হাসপাতাল কমিটির সেক্রেটারী। প্রিয়নাথের গুণগ্রাহী।

পরেশবাবু আসন গ্রহণ করলেন। যথারীতি চা ও জলখাবার এল। প্রিয়নাথ বললেন—তারপর, বলুন, হাসপাতালের কাজ কত দূর এগুলো?

পরেশবাবুর কথায় জানা গেল, একতলার দরজা-জানলা বসানো হয়েছে। এইবার দোতলার জন্যে মালপত্র আনা দরকার।

প্রিয়নাথ বললেন—তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করতে হবে পরেশ বাবু। এই কাজ যেদিন শেষ হবে সেদিন জানবো জীবনের শ্রেষ্ঠ সার্থকতা লাভ করেছি।

পরেশবাবু বললেন—চেষ্টার ত্রুটি করছি না মুখুজ্যে মশায়! কিন্তু সম্প্রতি কিছু ঠেকে গেছি।

ব্যস্ত হয়ে প্রিয়নাথ বললেন—টাকা নেই নাকি?

—আছে। তবে তা যথেষ্ট নয়।

—তাই তো।

তাঁর মৃত্যুর পর প্রথমে মনে করেছিলাম তাঁকেই যখন সঙ্গে নিতে পারলাম না, তখন কোন তীর্থে আমি আর যাব না।

পত্নীবৎসল এই স্নেহময় লোকটির কর্ম্মব্যস্ত জীবনের অন্তরালে যে গভীর বেদনা ছিল, প্রমীলার কাছে তা অজ্ঞাত ছিল না। আজ হঠাৎ তারই অভিব্যক্তি শুনে সে বুঝল, কালের অতিবাহনে সে-শোক আজও প্রশমিত হয়নি। সে মৌনমুখে তাঁর পানে তাকিয়ে রইল।

প্রিয়নাথ বলতে লাগলেন—কিন্তু কয়েক দিন আগে তাঁর কাছ থেকে আমি নির্দ্দেশ পেয়েছি যাবার। তিনি বলেছেন, দু'জনের অসমাপ্ত কাজ আমাকে শেষ করতে হবে। আমি গেলেই তাঁরও যাওয়া হবে, তিনি থাকবেন আমার সঙ্গে সঙ্গে।

প্রমীলা নীরবে শুনতে লাগল।

প্রিয়নাথ বললেন—এদিককার কয়েকটা ব্যবস্থার বাকী আছে। সেগুলি শেষ করে আমি বেরুব। অনেকদিন ধ'রে অনেক তীর্থে ঘুরব।

উৎসুক কণ্ঠে প্রমীলা প্রশ্ন করলে—কবে যাবেন? কই, আগে কিছু বলেননি তো!

মৃদু হেসে প্রিয়নাথ বললেন—এতদিন যে মনস্থির করতে পারিনি। তাই কিছু বলিনি।

—কবে যাবেন?

—দিন এখনও স্থির করিনি। তবে যত শীগ্‌গির হয়। মন চঞ্চল হয়েছে। পরেশবাবুর সঙ্গে হাসপাতালের কাজের একটা ব্যবস্থা করেছি। আর-একটা ব্যবস্থা বাকী আছে ভবতারণের সঙ্গে। আপিসের জন্যে ভাবি নে। অঘোর আমার চেয়েও কর্ম্মিষ্ঠ; আমার চেয়েও দক্ষ।

সুতরাং কোন দিক থেকেই প্রতিবন্ধক নেই। বেরুবার জন্যে ভারী উৎসুক হয়ে উঠেছি মা!

প্রমীলা চুপ করে রইল। প্রিয়নাথ বললেন—তোমায় ডেকেছি। ধীরে ধীরে এইবার সংসার বুঝে নাও। আমি নিশ্চিন্ত হই।

তাঁর কথায় প্রমীলার কর্ণমূলে আরক্ত আভা দেখা দিল।

দেরাজ থেকে এক গোছা চাবী বার করলেন প্রিয়নাথ।

—এইগুলি তোমার কাছে রাখো প্রমীলা! তিনটি পোষাকের আলমারীর চাবী, তোমার জেঠিমার ট্রাঙ্কের চাবী আর বাসনের সিন্দুকের চাবী আছে এর মধ্যে।

প্রিয়নাথ রিং-সমেত চাবীর গোছাটি প্রমীলার প্রসারিত হাতের দিকে এগিয়ে দিলেন। হঠাৎ কী এক আবেগে প্রমীলার সর্ব্বদেহ দুলে উঠল। হাত ফস্কে চাবীর গোছা সশব্দে মাটির উপর পড়ে গেল। ব্যস্ত ভাবে প্রমীলা গোছাটি তুলে নিয়ে মাথায় ঠেকাল।

*　　*　　*　　*　　*

—ভবতারণ!

—এসো ভাই, এসো!

প্রিয়নাথ ভবতারণবাবুর ঘরে ঢুকে বিছানার কাছে চেয়ার টেনে নিয়ে বসলেন।

একাদিক্রমে বাইশ বছর পরিশ্রম করবার পর বছর চারেক আগে ভবতারণবাবু বাতে আক্রান্ত হয়ে কাজ-কর্ম্মে অপরাগ হয়ে পড়েন। সেই সঙ্গে দেখা দেয় হার্টের অসুখ। করোনারি থ্রমবোসিস্। নানাবিধ

চিকিৎসা-পত্রের গুণে কিছু সুস্থ আছেন। ওঠা-হাঁটা, চলা-ফেরা বা কাজ-কর্ম্ম করার শক্তি নেই। নেই ডাক্তারের অনুমতিও।

কলেজ-জীবনে চার বছর একসঙ্গে পাশাপাশি বসে কাটিয়েছিলেন উভয়ে। প্রীতির সেই গ্রন্থি আজো অটুট আছে।

প্রত্যহ যেমন হয় আজো তেমনি নানা গল্প-গুজব হল। প্রিয়নাথ বাবুর তীর্থভ্রমণের কথা শুনে ভবতারণ বললেন—তোমার ভরসাতেই থাকা। অনেক দিন ধ'রে তুমি থাকবে না—তা ভাবতে ভাল লাগছে না।

মৃদু হেসে প্রিয়নাথ বললেন—উপযুক্ত প্রতিনিধি তো তোমায় দান করে যাচ্ছি। অসুবিধা বোধ করার কথা তো নয়।

বন্ধুর মুখের পানে তাকিয়ে ভবতারণ বললেন—তোমাকে নতুন করে বলবার কিছু নেই। সংসারে আমার একমাত্র বন্ধন ওই মা-হারা মেয়ে, তাও তোমাকে দিয়ে পরম নিশ্চিন্ত হয়েছি। আজ আর আমার কোন ইচ্ছে-অনিচ্ছে নেই। তুমি যে ব্যবস্থা করবে, তাকে স্বীকার করে নিতে একটুও দ্বিধা করব না। শেষ জীবনে তোমাকে যে পেলাম, সে আমার কত বড় সৌভাগ্যের ও সান্ত্বনার, তা ভাষায় বলা সম্ভব নয়।

ভবতারণ স্তব্ধ হলেন। ঝুঁকে পড়ে প্রিয়নাথ বন্ধুর একখানি হাত নিজের দুই হাতের মধ্যে টেনে নিলেন।

দু'জনেই নীরব।

ঘরের মধ্যে একটি করুণ প্রশান্তির সুর ভেসে বেড়াতে লাগল।

*   *   *   *   *

রেগে উঠেছে সুপ্রিয়। চোখ পাকিয়ে গম্ভীর স্বরে বললে—কোন্ সাহসে আর কোন্ অধিকারে তুমি আমার এমন ক'রে উত্যক্ত করছ, তা জানতে চাই ?

তেমনি গম্ভীর ভাবে প্রমীলা জবাব দিলে—এত দিন বাদে এই সোজা প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে তা কল্পনা করা কষ্টকর। প্রশ্নকর্ত্তার মাথার ঘিলুর মধ্যে কী আছে—ঘী না অন্য কিছু—তা জানতে ইচ্ছে করে।

—বটে! বলতে চাও, গোবর আছে ? অসহ্য!

—খবরদার! আর এক পা এগিয়েছো কি চেঁচাব।

হেসে ফেললে সুপ্রিয়।

—এই তো সাহস আর শক্তি! শেষ পর্য্যন্ত চীৎকার আর কান্নাই সম্বল আর অস্ত্র!

—ঈস্! আরও ঢের অস্ত্র আছে তূণে। সময় হলে ব্যবহার করতে কুণ্ঠিত হব না। এই বলে এক অপরূপ ভঙ্গীতে ঘুরে দাঁড়াল প্রমীলা।

—বথামিতে মেয়েরা যে ছেলেদের চেয়ে অনেক কাঠি সরেস, তার প্রমাণ পাওয়া গেল!

—মোটেই না। চ্যালেঞ্জ্ করলে তার জবাব দিতে অপারগ নই, এই কথাই শুধু জানিয়ে দিলাম। সাহসের আর অধিকারের কথা না তুললেই পারতে।

—একশোবার তুলব। বললে সুপ্রিয়—আমার ঘরে যদি ঢুকতে না দিই তো কোন্ অধিকারে ঢুকবে তুমি ?

উত্তরে, পিঠের দিকে আঁচলের কাপড়টাকে টান দিলে প্রমীলা। ঝনাৎ ক'রে চাবির গোছা হাতের উপর ফেলে বললে—চেয়ে দেখ এর পানে। এগুলো হল ওয়ার্ড্‌রোবের, এটা বাসনের সিন্দুকের আর এটি হল জেঠিমার ট্রাঙ্কের চাবী। উপস্থিত এইগুলির স্বত্ব পেয়েছি। এর পর পাবো এই বাড়ীর চাবী আর লোহার সিন্দুকের চাবী। সুতরাং, অতঃপর প্রয়োজন হলে তোমায় তালা বন্ধ ক'রে রাখতেও পারি। আবার বন্ধ-তালার বাইরে দাঁড় করিয়েও রাখতে পারি। এখন বোঝো, কোথা থেকে কেমন করে সাহস আর অধিকার পেলাম।

চাবীর গোছার পানে ক্ষণকাল তাকিয়ে রইল সুপ্রিয়। শেষ পর্য্যন্ত হার স্বীকার করতে হল তাকে। বললে—জয় হোক তোমার। "জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে, তুমি বিচিত্ররূপিণী।"

উত্তরে প্রমীলা বললে—"আমার চিত্তে তোমার সৃষ্টিখানি, রচিয়া তুলিছে বিচিত্র এক বাণী।"

—শোনাও না গানটা ?

—বাঃ। অমনি লোভ। আচ্ছা, শোনাবো, সন্ধ্যার সময় এসো আমার ফুল-বাগানে।

গভীর বিস্ময়ে সুপ্রিয় বললে—তোমার ফুলের বাগান! সে আবার কোথায় ?

কিছুদিন আগে প্রিয়নাথ তাঁর এই বাড়ীর সংলগ্ন পিছনের জমিটা কিনে নিয়েছিলেন ; পাঁচিল দিয়ে ঘেরা সেই জমিতে প্রমীলা অনেকগুলি ফুলের গাছ লাগিয়েছিল, তাদের মাথায় মাথায় ফুলের সমারোহ শুরু হয়েছে। সুপ্রিয় এ তথ্য জানতো না।

ঘাড় নেড়ে প্রমীলা বললে—সব কথাই এক নিঃশ্বাসে জেনে নেওয়ার চেয়ে একটু-আধটু না জানা থাকা ভাল। বলব না এখন।

হতাশ ভাবে সুপ্রিয় বললে—তথাস্তু। এই ব'লে সে জামার উপর কোট চড়িয়ে দিলে। সে বেরুবার উদ্যোগ করছে।

সঙ্গীতে প্রমীলার পারদর্শিতা সর্ব্বজনস্বীকৃত। কিছুদিন আগে সুপ্রিয়র আগ্রহে ও চেষ্টায় সে গ্রামোফোনে একটি গান দিয়েছে। সেই রেকর্ড আজ বাজারে বার হবে। সুপ্রিয় যাচ্ছে রেকর্ডের সন্ধানে।

প্রমীলা বললে—কোথায় চললে এখন? কোন্ রাজ-কাজে?

মৃদু হেসে সুপ্রিয় জবাব দিলে—একটু-আধটু না জানা থাকা ভাল। বলব না এখন।

মাথা হেলিয়ে প্রমীলা বললে—তথাস্তু।

* * * * *

প্রসন্ন প্রভাতে মেঘমুক্ত আকাশে প্রদীপ্ত ভাস্করের পথ-পরিক্রমার সঙ্গে যে স্বচ্ছ-সুন্দর দিনের সূচনা হয়েছিল, তার পরিসমাপ্তি ঘট্‌ল একান্ত অপ্রত্যাশিত ও আকস্মিক দৈব-দুর্য্যোগের আবর্ত্তে।

সন্ধ্যার পূর্ব্বে আকাশের কোণে যে মেঘ দেখা দিয়েছিল, অকস্মাৎ তার দিগন্ত-বিস্তৃত জটাজালে পৃথিবী অবলুপ্ত হল।

ঝড় উঠল। প্রচণ্ড হতে প্রচণ্ডতর তার বেগ কাঁপিয়ে তুললো নিখিল চরাচর। বজ্রবিদ্যুৎ-বৃষ্টির দাপটে কাঁপতে লাগল ঘর-দালান-পথ-প্রান্তর।

রাত্রি যত গভীর হল, ঝঞ্ঝাবাতের উন্মত্ততাও বেড়ে উঠল তত।

ঘুম নেই প্রিয়নাথের চোখে। জানলার বাইরে অনবরত কর্কশ-ভাষায় কে যেন তর্জ্জন-গর্জ্জন করছে...

ঘুম নেই সুপ্রিয়র চোখে। কানের পাশে গোঁ গোঁ শব্দে কে যেন কাতরাচ্ছে...

ঘুম নেই প্রমীলার চোখে। ঝড়ের সোঁ সোঁ শব্দের মধ্যে সে যেন কান্নার ধ্বনি শুনতে পাচ্ছে...কী এক অনির্দ্দেশ্য অশুভ অনুভূতির আতঙ্কে সে বারে বারে চকিত ত্রস্ত হয়ে উঠছে...

* সেই দিগন্তপ্লাবী ঝড়-বাদলের রাত্রে জন-মানব-শূন্য কর্দ্দমাক্ত পথের উপর ও কার ছায়া পায়ে পায়ে এগিয়ে চলেছে? কিসের অন্বেষণে কোথায় কোন্ দিকে তার গতি?

বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে ক্ষণে ক্ষণে! বজ্রপাত হচ্ছে নিকটে, দূরে। অবিরল জলধারায় পথ-ঘাট দুর্গম হয়ে উঠেছে।

ছায়ামূর্ত্তি এগিয়ে চলেছে। প্রিয়নাথবাবুর বাড়ীর সদর দরজা দেখা যাচ্ছে। পথিকের গতি রুদ্ধ হল সেই দরজার সম্মুখে।

* * * * *

কে যেন সদর দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে। কে যেন ডাকছে। প্রিয়নাথ চমকে উঠলেন। বিছানার উপর উঠে ব'সে ডাক দিলেন চাকরকে—ভৈরব, ভৈরব!

সাড়া পাওয়া গেল না। বারান্দার অপর প্রান্তে ভৃত্যের ঘর।

ক্ষণেক অপেক্ষা করে প্রিয়নাথ উঠলেন। এই দুর্য্যোগের মধ্যে কে এল? কে এল এত রাত্রে?

দরজা খুললেন। সঙ্গে সঙ্গে বাতাসের ধাক্কায় টলে পড়লেন। দরজাটা ধরে ফেলে সামলালেন নিজেকে।

অদূরে সদর দরজা। বাইরে থেকে কেউ যে তার উপর ধাক্কা দিচ্ছে তাতে সংশয় নেই। কোন বিপন্ন পথিক বুঝি আশ্রয় চাইছে?

এগিয়ে গিয়ে প্রিয়নাথ সদর দরজা খুলে দিলেন। বিদ্যুৎ চম্‌কাল। বাজ পড়ার শব্দে চমকে উঠল চারিদিক। সোঁ সোঁ আওয়াজে বাতাসের ঝলক ঢুকল খোলা দরজাকে দুলিয়ে দিয়ে।

আগন্তুকের কণ্ঠস্বর শোনা গেল—এই কি প্রিয়নাথ মুখুজ্যে মহাশয়ের বাড়ী?

প্রিয়নাথ উত্তর দিলেন—হ্যাঁ, কিন্তু আপনি......

—প্রিয়নাথ! বলে উঠলেন আগন্তুক—বন্ধু প্রিয়নাথ!

ভিতরে প্রবেশ করে তিনি নিজেই দরজাটা বন্ধ করে দিলেন। তারপর ফিরে দাঁড়িয়ে বললেন—আমায় চিনতে পারছো না প্রিয়নাথ?

আগন্তুকের মাথা মুখ সর্ব্বাঙ্গ বেয়ে জলের ধারা গড়িয়ে পড়ছে। বিমূঢ়-বিস্ময়ে প্রিয়নাথ তাঁর দিকে তাকালেন।

আগন্তুক বললেন—ভাল করে চেয়ে দ্যাখ তো।

বিস্ফারিত-চোখে প্রিয়নাথ বললেন—কালিনাথ! হ্যাঁ কালিনাথই তো! কালিনাথ! তুমি!

—যাক, চিনতে পেরেছো তা হলে! বাঁচলাম। দীর্ঘ পঁচিশ বছর পরে তা হলে আবার দেখা হল। খুঁজে পেলাম তোমায়!

কালিনাথের মুখে-চোখে এক বিচিত্র দীপ্তি ফুটে উঠল। বিহ্বল প্রিয়নাথ। সুদীর্ঘ পঁচিশ বছর আগে যে বেদনা-বিক্ষুব্ধ পরিবেশের মধ্যে বাল্যসাথীর সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটেছিল, তার সঙ্গে আবার যে কোন দিন দেখা হবে তা তো প্রিয়নাথ স্বপ্নেও ভাবতে পারেননি। কল্পনা করতে পারেননি, এমনি ঝড়ের রাতে ঘটবে তার আবির্ভাব।

দু'হাত বাড়িয়ে কালিনাথের দু'হাত চেপে ধরে উচ্ছ্বসিত আবেগে বলে উঠলেন—কী আশ্চর্য্য! কালিনাথ! তুমি! এত দিন পরে! এসো! ঘরের ভিতর এসো!

পরম সমাদরে তাঁকে নিজের শয়নকক্ষে নিয়ে গিয়ে বসালেন। ডাকাডাকি করে তুললেন ভৃত্যকে। বললেন—ভৈরব, চা করে দাও। আর, ঘরে কি খাবার আছে বার কর। আমার এক পরম বন্ধু এসেছেন।

উৎসাহে আবেগে প্রিয়নাথ স্পন্দমান। নিজের জামা-কাপড়-তোয়ালে বার করে দিলেন। কালিনাথ ভিজা কাপড়-জামা ছেড়ে প্রিয়নাথের শয্যার পাশে গদি-আঁটা চেয়ারের উপর গা মেলে বসলেন। ভৈরব চা ও খাবার নিয়ে এল।

* * * * *

দুই বাল্যসাথীর মধ্যে অতীত দিনের বিচিত্র কাহিনীর আলোচনা হতে লাগল। পঁচিশ-তিরিশ বছর আগেকার কথা। কালিনাথ মৃদুকণ্ঠে ধীরে ধীরে সেই বিগত স্মৃতির যে রোমন্থন করলেন, তা থেকে আমরা প্রায় সব কথাই জানতে পারলাম।

দৌড়-দাপটে আগড়পাড়ার মুখুজ্যে বংশের নামডাক ছিল বহুদূর বিস্তৃত। পুরুষানুক্রমে আভিজাত্য আর প্রভুত্বের যে মদগর্বিত ধারা

এই পরিবারের কর্তাদের রক্তের মধ্যে সঞ্চারিত ছিল, তার প্রচণ্ডতা চরম সীমায় পোঁচেছিল প্রিয়নাথের পিতা প্রমথনাথের জীবদ্দশায়। সারা গ্রাম তাঁর নামে কাঁপতো। তাঁর সামনে মাথা হেঁট করতো না এমন লোক গ্রামে ছিল না, একজন ছাড়া।

সেই অসাধারণ লোকটি হচ্ছেন কালিনাথের পিতা দুর্গাচরণ ন্যায়তীর্থ। দরিদ্র ব্রাহ্মণ। পেশা যজমানি। সম্বলের মধ্যে খড়ের দু'খানা বাড়ী আর বিঘে দুই জমি। মেয়ে দুটির বিবাহ দিয়েছেন। একমাত্র ছেলে কালিনাথ। স্থানীয় পাঠশালায় লেখাপড়ার পর সংস্কৃতে ব্যুৎপত্তি অর্জ্জন ক'রে সে পিতার কাজে সাহায্য করতে শুরু করেছে।

একই গ্রামের ছেলে প্রিয়নাথ আর কালিনাথ।. সমবয়সী। ভাবের অপ্রতুল ছিল না উভয়ের মধ্যে। স্কুলের পড়া শেষ করে প্রিয়নাথ চলে গেলেন কলকাতায় পড়তে। কালিনাথ গ্রামেই রয়ে গেলেন।

বিরোধ বাধল। এক দিকে প্রবল-প্রতাপ জমিদার প্রমথনাথ মুখুজ্যে, অপর দিকে গরীব পুজারী ব্রাহ্মণ দুর্গাচরণ ন্যায়তীর্থ।

দুর্গাপুজার সময় পাশের গ্রামে এক বারোয়ারী পূজা বসাল সেখানকার অধিবাসীরা। শোনা গেল, ধূমধামের আয়োজন হচ্ছে বিরাট। ব্যাপারটা প্রমথনাথের মনঃপুত হল না। জানা গেল সেই পুজায় পুরোহিত নিযুক্ত হয়েছেন দুর্গাচরণ।

প্রমথনাথ দুর্গাচরণকে ডেকে পাঠিয়ে বললেন, যারা টেক্কা দিয়ে পুজার ব্যবস্থা করছে তাদের পুজার ভার নেওয়া চলবে না দুর্গাচরণের।

দুর্গাচরণ বিস্মিত হলেন। বললেন, কথা দিয়েছেন তিনি।

প্রমথনাথ তর্ক করলেন, তারপর অত্যন্ত জেদাজেদি শুরু করে দিলেন। কিন্তু দুর্গাচরণ অটল। কথা যখন দিয়েছেন তখন তার খেলাপ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়।

প্রমথনাথ আর কিছু বললেন না। কিন্তু ভুললেন না তাঁর এই পরাজয়।

তারপর পদে পদে সংঘাত ঘটতে লাগল উভয়ের মধ্যে। প্রমথনাথ প্রতিশোধ চান, কিন্তু দুর্গাচরণের মাথা হেঁট করার সাধ্য বুঝি তাঁর নেই।

নেই? প্রমথনাথ ক্ষেপে উঠলেন। এবং শেষ পর্য্যন্ত টাকার জোরে প্রতিশোধ নিলেন ভাল করেই।

মিথ্যা মামলার দায়ে দুর্গাচরণ সর্ব্বস্বান্ত হলেন। কিন্তু তবুও তাঁর মাথা হেঁট হল না।

বন্ধুরা বললে, একবার প্রমথনাথের কাছে গিয়ে দুর্গাচরণ যদি দাঁড়ান, তা হলে তৎক্ষণাৎ সব কিছু মিটে যায়। দুর্গাচরণ শুধু মৃদু হাসলেন। তারপর স্ত্রী-পুত্রের হাত ধরে মাথা উঁচু করেই গ্রাম পরিত্যাগ করলেন।

কালিনাথের মুখে সেই পুরাতন কাহিনীর পুনরাবৃত্তি শুনতে শুনতে প্রিয়নাথ বারংবার নিদারুণ লজ্জায় বিহ্বল হয়ে পড়ছিলেন। বারে বারে বন্ধুর দু'হাত চেপে ধরে বলছিলেন—থাক ভাই, থাক। বড় লজ্জা বোধ করছি।

কালিনাথ তাঁকে আশ্বস্ত করলেন। এর মধ্যে প্রিয়নাথের লজ্জা পাবার কোন কারণ বা প্রয়োজন নেই। প্রিয়নাথ তো কোন দিন কালিনাথকে কোন দুঃখ দেননি; বরং যত দিন কাছাকাছি ছিলেন, তত দিন উভয়ের মধ্যে প্রগাঢ় প্রীতির বন্ধনই ছিল। প্রিয়নাথের উদার মহৎ অন্তঃকরণের পরিচয় কি কালিনাথের অজানা?

প্রিয়নাথ মৌন হয়ে রইলেন। কালিনাথ বিগত দিনের সেই শোচনীয় ও বেদনাক্লিষ্ট কাহিনীর শেষ পরিচ্ছেদ বিবৃত করলেন।

দেশ-দেশান্তর ঘুরে কাশীধামে গিয়ে কালিনাথের বাবা আর মা দু'জনেই মারা গেলেন অল্পদিনের ব্যবধানে। কালিনাথ নিশ্চিন্ত হলেন। বাঁধন আর দায়িত্ব রইল না কিছুই। এখন তিনি বেপরোয়া। যা খুসী তাই করতে পারেন! মনে মনে নানা সংকল্প আঁটলেন। নানা কাজে নিজেকে ব্যাপৃত করলেন। কিন্তু কিছুতেই নিজেকে বাঁধতে পারলেন না। অবশেষ আবার নিজের দেশেই ফিরে এলেন।

শান্ত-সমাহিত কণ্ঠে তিনি বলতে লাগলেন—দেশের মাটিতে পা দিয়ে প্রথমেই মনে পড়ল তোমার কথা। বাল্যকালের বন্ধু তুমি। আমাদের পিতৃপুরুষের কাজ বা অকাজের জন্যে আমরা তো দায়ী নই। তোমাকে চিনতে আমার ভুল হয়নি। আমি জানতাম, তোমার মনের কোণে আমার জন্যে সত্যিকারের সহানুভূতি সঞ্চিত আছে।

উচ্ছ্বসিত-কণ্ঠে প্রিয়নাথ বললেন—আছে বন্ধু, নিশ্চয় আছে।

কালিনাথ হাসলেন। বললেন—তাই তো তোমার কাছেই সর্বাগ্রে এলাম।

—বেশ করেছো। এবং যখন এসেছো তখন আমার কাছেই থাকো, অনেক দিন, যত দিন তোমার ইচ্ছে।

—থাকবো ? তোমার কাছে ?

—হ্যাঁ, বন্ধু ! আমার কাছে। একসঙ্গে।

কালিনাথ পূর্ণ-দৃষ্টিতে তাকালেন প্রিয়নাথের দিকে। ধীরে ধীরে বললেন—আচ্ছা। তাই হবে।

* * * *

হঠাৎ সোজা হয়ে বসলেন প্রিয়নাথ। আয়ত দুই চোখের দৃষ্টি জানলার বাইরে নিবদ্ধ। কিয়ৎকাল চুপ করে কি যেন ভাবলেন। তারপর বললেন—তোমার বাড়ী, জমি, বাগান, সব কিছু আমি তোমায় ফিরিয়ে দেব কালিনাথ। প্রায়শ্চিত্ত করবো বিধিমতে।

সকাল-বেলা দুই বন্ধুতে বসে জলযোগ করছিলেন। কালিনাথকে সমাদর করবার আগ্রহে প্রিয়নাথের ব্যস্ততার অবধি নেই। ঘন ঘন ভৈরবকে ডেকে নানাবিধ আদেশ করছেন।

পুরানো কথার আলোচনার জের তখনো বোধ হয় মেটেনি। সেই প্রসঙ্গেই প্রিয়নাথ বলে উঠলেন—আমি আজই এ বিষয়ে এটর্ণীর সঙ্গে কথা বলব।

উত্তরে কালিনাথ ক্ষুব্ধ-কণ্ঠে বললেন—তুমিও আমার প্রতি অবিচার করবে শেষ পর্য্যন্ত ?

—অবিচার ! আমি ! তোমার প্রতি ! সে কি কথা !

উদ্বেলিত হলেন প্রিয়নাথ বিস্ময়ে হতাশায় !

কালিনাথ বললেন—তুমি কি ভেবেছ, এতদিন পরে আমি যে তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি তা বিষয় ফিরে পাবার আশায় ?

—না, না, তা নয়। তবে—

—"তবে"-র পর আর কিছু নেই। কালিনাথ মাথা দোলাতে দোলাতে বলতে লাগলেন—বিষয়-আশয় বাড়ী-ঘর বাগান-পুকুর, তাদের প্রতি প্রাণে কোন মায়া-মমতা আর নেই, প্রিয়নাথ! অনেক দেখলাম, অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি কম নয়। বিষয়-সম্পত্তি, ধন-দৌলত, সম্মান-প্রতিপত্তি, পুতুল-খেলার মতো মানুষ এই সব নিয়ে যে খেলায় ব্যাপৃত থাকে তা দেখলে হোগলা-ঘেরা চালার মধ্যে পুতুল-নাচের কথাই মনে পড়ে, হাসি পায়। ওদিক থেকে কোন মোহ নেই প্রিয়নাথ, কোন লোভ নেই। তুমি নিশ্চিন্ত হতে পারো।

প্রিয়নাথ উদ্দীপ্ত হলেন—কিন্তু আমার কর্ত্তব্য! যখন তোমাকে আবার পেয়েছি তখন—

হঠাৎ কালিনাথ হেসে উঠলেন—নেব, নেব, যা প্রয়োজন, তা তোমার কাছে চেয়ে নেব।

* * * * *

সুপ্রিয় নীচে নামলো। দেখলো, এক অপরিচিত ভদ্রলোকের সঙ্গে বাবা মহা হাসিখুসী মুখে গল্পগুজব করছেন।

প্রিয়নাথ হাঁক দিলেন—এদিকে এসো খোকা।

এ-নামে সুপ্রিয়র বড় আপত্তি। বিশেষ, বাইরের লোকের সামনে। বাবাকে বলে বলে আর পারা গেল না। সুপ্রিয় কাছে এসে দাঁড়াল। ভাবগম্ভীর মুখে সংক্ষেপে প্রিয়নাথ বললেন—এঁকে প্রণাম করো। পায়ের ধূলো নাও। এঁর নাম কলিনাথ চৌধুরী। এক গ্রামে আমরা একত্রে মানুষ। ভায়ের মতো। এঁকে কাকা ব'লে জানবে।

—বেশ করেছো। এবং যখন এসেছো তখন আমার কাছেই থাকো, অনেক দিন, যত দিন তোমার ইচ্ছে।

—থাকবো ? তোমার কাছে ?

—হ্যাঁ, বন্ধু ! আমার কাছে। একসঙ্গে।

কালিনাথ পূর্ণ-দৃষ্টিতে তাকালেন প্রিয়নাথের দিকে। ধীরে ধীরে বললেন—আচ্ছা। তাই হবে।

* * * *

হঠাৎ সোজা হয়ে বসলেন প্রিয়নাথ। আয়ত দুই চোখের দৃষ্টি জানলার বাইরে নিবদ্ধ। কিয়ৎকাল চুপ করে কি যেন ভাবলেন। তারপর বললেন—তোমার বাড়ী, জমি, বাগান, সব কিছু আমি তোমায় ফিরিয়ে দেব কালিনাথ। প্রায়শ্চিত্ত করবো বিধিমতে।

সকাল-বেলা দুই বন্ধুতে বসে জলযোগ করছিলেন। কালিনাথকে সমাদর করবার আগ্রহে প্রিয়নাথের ব্যস্ততার অবধি নেই। ঘন ঘন ভৈরবকে ডেকে নানাবিধ আদেশ করছেন।

পুরানো কথার আলোচনার জের তখনো বোধ হয় মেটেনি। সেই প্রসঙ্গেই প্রিয়নাথ বলে উঠলেন—আমি আজই এ বিষয়ে এটর্ণীর সঙ্গে কথা বলব।

উত্তরে কালিনাথ ক্ষুব্ধ-কণ্ঠে বললেন—তুমিও আমার প্রতি অবিচার করবে শেষ পর্য্যন্ত ?

—অবিচার ! আমি ! তোমার প্রতি ! সে কি কথা !

উদ্বেলিত হলেন প্রিয়নাথ বিস্ময়ে হতাশায় !

কালিনাথ বললেন—তুমি কি ভেবেছ, এতদিন পরে আমি যে তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি তা বিষয় ফিরে পাবার আশায় ?

—না, না, তা নয়। তবে—

—"তবে"-র পর আর কিছু নেই। কালিনাথ মাথা দোলাতে দোলাতে বলতে লাগলেন—বিষয়-আশয় বাড়ী-ঘর বাগান-পুকুর, তাদের প্রতি প্রাণে কোন মায়া-মমতা আর নেই, প্রিয়নাথ! অনেক দেখলাম, অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি কম নয়। বিষয়-সম্পত্তি, ধন-দৌলত, সম্মান-প্রতিপত্তি, পুতুল-খেলার মতো মানুষ এই সব নিয়ে যে খেলায় ব্যাপৃত থাকে তা দেখলে হোগলা-ঘেরা চালার মধ্যে পুতুল-নাচের কথাই মনে পড়ে, হাসি পায়। ওদিক থেকে কোন মোহ নেই প্রিয়নাথ, কোন লোভ নেই। তুমি নিশ্চিন্ত হতে পারো।

প্রিয়নাথ উদ্দীপ্ত হলেন—কিন্তু আমার কর্ত্তব্য! যখন তোমাকে আবার পেয়েছি তখন—

হঠাৎ কালিনাথ হেসে উঠলেন—নেব, নেব, যা প্রয়োজন, তা তোমার কাছে চেয়ে নেব।

* * * * *

সুপ্রিয় নীচে নামলো। দেখলো, এক অপরিচিত ভদ্রলোকের সঙ্গে বাবা মহা হাসিখুসী মুখে গল্পগুজব করছেন।

প্রিয়নাথ হাঁক দিলেন—এদিকে এসো খোকা।

এ-নামে সুপ্রিয়র বড় আপত্তি। বিশেষ, বাইরের লোকের সামনে। বাবাকে বলে বলে আর পারা গেল না। সুপ্রিয় কাছে এসে দাঁড়াল। ভাবগম্ভীর মুখে সংক্ষেপে প্রিয়নাথ বললেন—এঁকে প্রণাম করো। পায়ের ধুলো নাও। এঁর নাম কলিনাথ চৌধুরী। এক গ্রামে আমরা একত্রে মানুষ। ভায়ের মতো। এঁকে কাকা ব'লে জানবে।

সুপ্রিয় পিতৃ-আজ্ঞা পালন করলে। কালিনাথ উঠে দাঁড়িয়ে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। প্রিয়নাথের চোখে জল এলো।

*   *   *   *   *

নিয়ে গেলেন কালিনাথকে ভবতারণের কাছে। পরিচয়াদি হল। প্রমীলা যথারীতি তাঁকে প্রণাম করলে। কালিনাথ মুক্তকণ্ঠে আশীর্ব্বাদ জানালেন।

সেখান থেকে গেলেন হাসপাতাল নির্ম্মাণ পরিদর্শন করতে। পরিচয় করিয়ে দিলেন সেখানে যারা ছিল প্রত্যেকের সঙ্গে।

ষ্ট্র্যাণ্ড রোড। আপিস। বিশ্বস্ত ম্যানেজার অঘোর পাঠক অভ্যর্থনা জানালো। সোজাসুজি প্রিয়নাথ বললেন—অঘোর, ইনি শুধু আমার বন্ধু নন, ভাইও বটে। আমার অনুপস্থিতিতে এঁর পরামর্শ মতো কাজ করবে। বিদ্যাবুদ্ধিতে ইনি কারুর চেয়ে খাটো নন অঘোর! তুমি তো জানো না সব কথা···

—থাক, থাক প্রিয়নাথ!

কালিনাথ বাধা দিলেন বন্ধুর উচ্ছ্বাসে। অতঃপর উভয়ে বাড়ীমুখো হলেন।

হঠাৎ জোয়ার এলে জল যেমন ফেঁপে-ফুলে উঠে দুকূল প্লাবিত করে, কালিনাথকে পেয়ে প্রিয়নাথও যেন তেমনি ফেনিল উচ্ছ্বসিত হোয়ে উঠেছেন। হাসি আর গল্পের বিরাম নেই। পুরনো কথা। রহস্য-রসিকতা। ফষ্টি-নষ্টি।

বরাহনগরের প্রান্তে মুখুজ্যেদের বিরাট বাগানবাড়ী। বড় বড়

থাম আর পদ্মকাটা অলিন্দের কারুকার্য্যে একদা যে-বাড়ীর শোভা রসজ্ঞদের অবিমিশ্র প্রশংসা অর্জ্জন করেছে, যার দীর্ঘ-প্রসারিত নাচঘরের মূল্যবান পারসিক গালিচা আর দেওয়ালের পাশ্চাত্যরীতিতে আঁকা নারীমূর্ত্তির আকর্ষণে বহু খ্যাতিমান রসিক যেখানে বহু রাত্রি বিনিদ্র যাপন করেছেন, সেই বাড়ী আজ হতশ্রী, তার ফুলবাগানে আজ আগাছার সমারোহ।

পিতার মৃত্যুর পর প্রিয়নাথ সপরিবারে কলকাতায় চলে আসেন। অরসিক ছিলেন না তিনি। গান-বাজনায় রসবোধ ছিল যথেষ্ট। কিন্তু বাগানবাড়ীর প্রয়োজন বোধ করেন নি কোন দিন। দু'-তিন বছর বড়দিনের সময় ব্যবসায়ী সাহেবদের খানাপিনার আয়োজন করেছিলেন সেখানে। সে-সব দিন গত হয়েছে। বাগানবাড়ী এখন একজন মালির হেপাজতে তালাবদ্ধ অবস্থায় যেন যখের বাড়ী।

কালিনাথের আগ্রহে দুই বন্ধু একদিন সেখানে গেলেন। নাচঘরের তালা খোলা হ'ল। অনেক দিন বাদে খোলা বাতাসের স্পর্শ পেয়ে প্রকাণ্ড ঝাড়লণ্ঠনের কাঁচগুলো ঠুং-ঠাং শব্দে বেজে উঠল। ফ্রেমে-আঁটা সুন্দরীদের বিলোল কটাক্ষে প্রাণের স্পন্দন জাগল।

ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে মাথা দুলিয়ে কালিনাথ বললেন—এমন বাড়ী আর এমন ঘর এই অবস্থায় দেখে আনন্দ বোধ করতে পারলাম না বন্ধু! তোমার বাপ-পিতামহের যে রসজ্ঞান ছিল, জীবনকে উপভোগ করবার যে আয়োজন ছিল, তা যে কেমন ক'রে তোমার মধ্যে থেকে একেবারে অন্তর্হিত হোল তা ভাববার বিষয়! এই ঘরে কত দিন কত রাত কত গানের জলসা বসেছে, দেশের সব চেয়ে বড়

গাইয়ে-বাজিয়ে এখানে তাদের দক্ষতা প্রকাশ করবার সুযোগ পেয়ে নিজেদের ধন্য মনে করেছে, গহরজান, নূরজাহান, জানকিবাঈ...

কালিনাথের বাক্যস্রোতে বাধা দিয়ে প্রিয়নাথ বললেন—সে সব দিন আজ আর নেই ভাই!

কালিনাথ মাথা নাড়লেন—তা অবিশ্যি! কর্তারা যা করে গেছেন তা ভাবলেও এখনো রোমাঞ্চ হয়, কিন্তু তাই ব'লে তুমি যে একেবারে বৈরাগী ব'নে গিয়ে জীবনের সকল আনন্দকে অস্বীকার করে চলবে, চিরজীবন শুধু কঠোর পরিশ্রমই করে যাবে, জীবনের রসাস্বাদনে কিছুমাত্রও ইচ্ছুক হবে না, তারও কোন অর্থ হয় না।

চুপ করে রইলেন প্রিয়নাথ। বন্ধুর হৃদয়োচ্ছ্বাসে বাধা দিয়ে লাভ কি?

কালিনাথ বলতে লাগলেন—অবিশ্যি আমি বলছি না যে তুমি কর্তাদের উপর টেক্কা দাও বা তেমনিতর পথ অনুসরণ কর। তা না করেও কি আনন্দের আসর বসানো যায় না? এককালে তুমিও তো গান-বাজনা শুনতে কম ভালবাসতে না? আমার জীবনে সহস্র আঘাত সত্ত্বেও ও-জিনিষটার প্রতি মোহ কাটেনি। বল তো, একদিন একটু আয়োজন করি। দু'-একজন ভাল ওস্তাদ সম্প্রতি কলকাতায় এসেছে, শুনেছি।

প্রিয়নাথ আপত্তি করবার পথ পেলেন না।

* * * * *

হাজার বাতির ঝাড়লণ্ঠন আবার জ্বলল। মালিন্য-মুক্ত কার্পেটের কারুকার্য্যের উপর মহার্ঘ পোষাকে সজ্জিতা, মণিমুক্তাখচিত অলঙ্কারে

ভূষিতা দিল্লীর শ্রেষ্ঠা গায়িকা মালকাজান তার সঙ্গীতের আসর বসালো। দীর্ঘদিন পরে ঘরের দেওয়াল, আসবাব, শয্যা আর সজ্জা প্রাণ-প্রাচুর্য্যে আবার ফেনিল হোয়ে উঠল।

ভারী খুসী প্রিয়নাথ। ইমনের সঙ্গে কল্যাণ যুক্ত হোয়ে যে স্বতন্ত্র রাগিণীর ঝঙ্কার তিনি শুনছেন তা তাঁর প্রাণের ভিতরকার দুটি সুর, আকাঙ্ক্ষা আর আনন্দকে একসঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছে। সঙ্গীতরসের বোদ্ধা তিনি। এ তথ্য বুঝতে বিলম্ব হয়নি গায়িকার। লাস্য-লীলা-কণ্ঠ-মাধুর্য্যে ঘরের মধ্যে যাদুর মায়া বিস্তারিত হল।

নাচ-গান শেষ হল। প্রিয়নাথ উঠে দাঁড়ালেন। দুই চোখে অভিনব দীপ্তি। পকেট থেকে এক গোছা নোট বার ক'রে গায়িকাকে বখশিষ দিলেন। কালিনাথ মুচকে মুচকে হাসতে লাগলেন।

সকলে বিদায় নিলে বন্ধুর দিকে ফিরে প্রিয়নাথ বললেন—হাসছো যে ?

—তোমার খুসীর মাত্রার আধিক্য দেখে। বললেন কালিনাথ।

উত্তরে প্রিয়নাথও হাসতে লাগলেন।

—ভাল লাগল গান ?

সোল্লাসে প্রিয়নাথ বললেন—চমৎকার !

কালিনাথ মুখ টিপে বললেন—চমৎকার ? গান ? না, গায়িকা ?

মুহূর্ত্তে প্রিয়নাথ একেবারে যেন কুঁকচে গেলেন।

—আঃ ! কী যে বলো !

* * * * *

বাতাস বইছে একটানা। পাল তুলে দেওয়া হয়েছে। নৌকা ভেসে চলেছে বাধাবন্ধহীন।

প্রিয়নাথের জীবনে এক নূতন গতি এনে দিয়েছেন কালিনাথ। তাঁকে পেয়ে প্রিয়নাথ যেন কৃতকৃতার্থ হয়েছেন। জীবনকে যে এমন করে উপভোগ করা যায় তা আগে কে জানতো ?

কার্নিভাল এসেছে কলকাতায়। সন্ধ্যার পরে অগণিত নরনারীর সমাবেশ সেখানে। কালিনাথ বললেন—চল না দেখে আসি। নানা রকমের মজা !

গেলেন দু'জনে।

এ-সব দৃশ্য, এ-সব অভিজ্ঞতা প্রিয়নাথের জীবনে নূতন। তাঁর আগ্রহ আর উত্তেজনার অন্ত নেই। অনেক রাত পর্য্যন্ত নানা "খেলায়" যোগদান করলেন। প্রত্যেক টেবিলে কালিনাথ তাঁকে খেলাগুলির কলা-কৌশল বুঝিয়ে দিতে লাগলেন। অনেক খেলায় অনেক টাকা যেমন হারলেন, অনেক স্থানে জিতলেনও অনেক টাকা। প্রিয়নাথের বিস্ময় আর আনন্দের অবধি নেই। টাকার এ কী আশ্চর্য্য রীতি ! এই যাচ্ছে আবার এই আসছে !

শেষ পর্যন্ত এক রকম জোর করেই কালিনাথ তাঁকে সেদিনকার মতো খেলার আকর্ষণ থেকে ফিরিয়ে আনলেন।

* * * * *

বাতাসে লাগল দোলা। আকাশে বুঝি মেঘ দেখা দিয়েছে।

সকাল বেলায় দুই বন্ধু প্রতিদিনের মত প্রাতরাশের সঙ্গে খোস

মেজাজে খোসগল্প শুরু করেছেন, এমন সময় ম্যানেজার অঘোর পাঠক এসে ঘরে ঢুকলো।

মুখ তুলে প্রিয়নাথ বললেন—অঘোর যে! এমন সময়ে?

অঘোর নিরুত্তর। অথচ তার চোখে-মুখে অনেক কথাই প্রকাশিত হবার অপেক্ষায় রয়েছে বলে মনে হলো।

—কি খবর? কিছু বলতে চাও?

প্রিয়নাথের প্রশ্নের উত্তরে ঘাড় নেড়ে অঘোর বললে—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—বল।

অঘোর চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

ক্ষণেক তার পানে চেয়ে প্রিয়নাথ বললেন—যা বলতে চাও বল। তুমি তো জান, কালিনাথের কাছে আমার কিছুই গোপন করবার প্রয়োজন নেই।

কালিনাথ একটু ব্যস্ত ভাবেই বললেন—না হয় আমি ও ঘরে...

তাঁর দু'হাত চেপে ধরে প্রিয়নাথ বললেন—বস তুমি। বল অঘোর।

অঘোর হাতের ফাইলখানা খুলে প্রিয়নাথের সামনে একখানা চিঠি মেলে ধ'রে ধীরে ধীরে তার বক্তব্য প্রকাশ করলে।

ব্যবসায়ের জটিল আবর্ত্ত। মাঝে মাঝে যার আবির্ভাব ঘটে। সহসা এক সমস্যা-সঙ্কুল জটিলতা দেখা দিয়েছে প্রিয়নাথের ব্যবসায়ের গতিপথে। চুক্তি অনুসারে কাজ করার যে আইনগত দায়িত্ব আছে তা পালন করতে গেলে উপস্থিত এখনই পঞ্চাশ হাজার টাকার প্রয়োজন। টাকার অঙ্কটা অবশ্য বেশী নয়। তবে ইতিমধ্যে আরও কয়েকখানা চেক কাটা হয়েছে যাদের জন্যে ব্যাঙ্কে টাকা মজুত থাকা

চাই। আর এদিকে ঐ পঞ্চাশ হাজার টাকা আগামী কাল চারটার মধ্যেই হাতে আসা দরকার।

অঘোরের কথা শুনে প্রিয়নাথ কিছু অন্যমনস্ক হ'য়ে পড়লেন। মনিবের পানে তাকিয়ে অঘোর বললে—আমি একটা ব্যবস্থা করেছি। আজ দুপুরে যদি আপনি একবার আপিসে আসেন তাহলেই...

চকিতে প্রিয়নাথের মুখের পানে দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে কালিনাথ বললেন—কাল ঠিক কখন টাকাটা পেলে আপনার চলবে ম্যানেজার মশায় ?

প্রিয়নাথ মুখ তুলে বললেন—অ্যাঁ। কি বলছ ?

কালিনাথ বললেন—তোমায় কিছু বলি নি। এই বলে তিনি জিজ্ঞাসুনেত্রে অঘোরের পানে তাকালেন।

মৃদুকণ্ঠে অঘোর জবাব দিলে—দুপুরের মধ্যে পেলেই ভাল হয়! তা, সে আমি...

কালিনাথ বললেন—বেশ তাই হবে। কাল বারোটা নাগাদ আমরা আপনার আপিসে যাব।

প্রিয়নাথ অবাক হলেন। বিমূঢ় বোধ করল অঘোর। ক্ষণেক নীরব থেকে বললে—তা হলে আজ একবার...

কালিনাথ জবাব দিলেন—তার আর দরকার কি ? কাল একেবারে টাকাটা সঙ্গে নিয়ে আপিসে উপস্থিত হব।

অঘোর মনিবের দিকে তাকিয়ে তাঁর নির্দ্দেশের অপেক্ষা করতে লাগল। প্রিয়নাথ তাকালেন কালিনাথের দিকে। কালিনাথ

বললেন—একটা সহজ ব্যবস্থা করে ফেলতে পারবো আশা করছি। তাই ঐ কথা বললাম।

প্রিয়নাথ দুলে উঠলেন। মস্ত একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন—ও, তাই বল! তা হলে অঘোর, তুমি এখন যাও। আর তো কোন কথা নেই?

—আজ্ঞে না।

—আচ্ছা, তাহলে কাল দেখা হবে।

*　　*　　*　　*　　*

কালিনাথের যে কথা সেই কাজ। এর চেয়ে সহজ ব্যবস্থা আর কি হতে পারে! দুপুরে বাড়ী ব'য়ে এসে এক মাড়োয়ারী টাকা দিয়ে গেল। অবশ্য কালিনাথ তাকে গিয়ে ডেকে এনেছিলেন। কোন কিছু হাঙ্গামাই হল না। সামান্য এক চিল্‌তা কাগজের উপর একটুখানি সই। হ্যাণ্ডনোট।

টাকা দিয়ে মাড়োয়ারী নিজেই যেন কৃতার্থ হয়ে গেছে। কথায় আর আচরণে কি বিনয় আর সৌজন্য! যখনই প্রিয়নাথের দরকার হবে তখনই টাকা দেবার জন্যে প্রস্তুত থাকবে উক্ত মাড়োয়ারী মহাজন। এমনি ধরণের নানা মিষ্ট কথার পর লোকটি বিদায় নিলে।

নোটগুলি বাক্সের মধ্যে রেখে বিছানার উপর ব'সে কালিনাথের পানে তাকিয়ে প্রিয়নাথ ভারী গলায় বললেন—বন্ধু বটে তুমি আমার!

*　　*　　*　　*　　*

চিন্তিত হয়েছেন ভবতারণ। ইদানীং প্রিয়নাথের দেখা পান না।

তিনি। যে-প্রিয়নাথ প্রত্যহ শত কাজের মধ্যেও তাঁর সংবাদ নিতে আসতেন, তাঁর কাছে বসে দু'দণ্ড আলাপ করে যেতেন, আজ-কাল তাঁকে ডেকেও সাড়া পাওয়া যায় না। বলে পাঠান, কাজে-কর্ম্মে বড় ব্যস্ত, সময় পেলেই আসবেন। ভবতারণের ইচ্ছা ছিল, সামনের মাসেই শুভকর্ম্ম নিষ্পন্ন করবেন। কিন্তু তার কোন সম্ভাবনাই আপাতত দেখা যাচ্ছে না।

চিন্তিত হয়েছে সুপ্রিয়। পিতার আচরণে এবং দৈনন্দিন কর্ম্মজীবনে পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করে সে অস্বস্তি বোধ করছে। দুঃস্থ দরিদ্র আর অভাবগ্রস্ত মানুষের ভীড় আর জমে না সকাল বেলা। সারাদিন তিনি কালিনাথের সঙ্গে যাপন করেন। বেশী সময় বাড়ীর বাইরে। দুই চোখে তাঁর এক অস্বাভাবিক দীপ্তি লক্ষ্য করেছে সুপ্রিয়, যা তার ভাল লাগেনি। কি জানি কেন, কালিনাথের প্রতি সুপ্রিয়র বিতৃষ্ণার অবধি নেই। সুপ্রিয় অত্যন্ত বিষন্ন ও নিরানন্দ বোধ করছে।

চিন্তিত হয়েছে প্রমীলা। হঠাৎ তার পরম শ্রদ্ধেয় ও পুজনীয় জ্যেঠামশায়ের এ কী হল! তাকে দেখে আগেকার মত তাঁর চোখে-মুখে স্নেহ আর আনন্দের দীপ্তি তো আজ-কাল আর ফুটে ওঠে না! কথায় সে স্নেহের সুর কৈ? প্রমীলাকে যেন এড়িয়ে যেতে চান তিনি। কি এক অনির্ণেয় আশঙ্কায় প্রমীলার অন্তর আচ্ছন্ন হয়ে উঠছে ক্ষণে ক্ষণে।

চিন্তিত হয়েছে অঘোর পাঠক। মনিব প্রায় রোজই আপিসে আসেন বটে, কিন্তু তা কাজ-কর্ম্ম দেখার জন্যে নয়। আসেন টাকা নিতে। অনেক কাজ আটকে আছে। যে-প্রতিষ্ঠানের সম্ভ্রম আজও

আছে আকাশস্পর্শী, বর্ত্তমান সঙ্কটকালে তাকে বজায় রাখতে গেলে যে যত্ন এবং তীক্ষ্ণদর্শিতার প্রয়োজন তার কোন আভাসই পাওয়া যায় না কর্ত্তার আচরণে। অথচ এর চেয়ে অনেক জটিলতর গ্রন্থি তিনি অবহেলে মোচন করেছেন অতীত কালে বহু বার। দু'-একবার অঘোর মনিবকে বোঝাবার চেষ্টা করেছে। উত্তরে প্রিয়নাথ তাকে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে এত দিন পরে ম্যানেজারের কাছে কোন-কিছু বোঝবার প্রয়োজন তাঁর নেই।

চিন্তিত হয়েছেন গুণগ্রাহী পরেশ বাবু, যাঁর কাছে প্রিয়নাথ ছিলেন দেবতার মত ভক্তির পাত্র। হাসপাতালের কাজ বন্ধ আছে। একদা যে-চেকগুলি প্রিয়নাথ পরেশ বাবুকে দিয়েছিলেন সে-গুলি তিনি ফেরৎ নিয়েছেন। ব্যবসায়-কর্ম্মে নানা গোলমাল, তাই প্রিয়নাথ এখন হাসপাতালের কাজে টাকা ঢালবার কল্পনাকে প্রশ্রয় দিতে পারছেন না। টাকার জন্যে পরেশ বাবুর দুঃখ নেই। কিন্তু অমন সদাপ্রফুল্ল দেবোপম মানুষটির মধ্যে সহসা এমন অস্বাভাবিক পরি-বর্ত্তন এল কেমন ক'রে? তিনি রেসে যাচ্ছেন, জুয়া খেলছেন, নানা স্থানে জলসা ও গান-বাজনার আসরে সকলের চেয়ে বেশী হৈ-হল্লা করছেন, এ-সংবাদ যেমন কল্পনাতীত তেমনি বেদনাদায়ক। কিন্তু সংবাদ মিথ্যা নয়।

চিন্তিত হয়েছে বিশ্বস্ত ভৃত্য ভৈরব। যাকে তিনি চিরদিন ছেলের মত দেখেছেন, যার অসুখ করলে তিনি স্নানাহার ত্যাগ করে ছুটোছুটি করেছেন, সকাল থেকে শুরু করে রাত বারটা পর্য্যন্ত যে-ভৈরব ছিল তাঁর সর্ব্ব সময়ের সঙ্গী, তাকে তিনি আজ-কাল অনেক দূরে

সরিয়ে দিয়েছেন। সে যে সামান্য চাকর, এই তথ্য কালিনাথ মারফৎ তাকে বারংবার বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে।

* * * * *

চিন্তিত নন প্রিয়নাথ নিজে। বহুদিন পরে সকল ভাবনার হাত এড়িয়ে তিনি এক নূতন আনন্দ-লোকের সন্ধান পেয়েছেন যেন। নিত্য-নব আনন্দ পরিবেশনে বন্ধু কালিনাথের জুড়ি মেলা ভার।

বাগানবাড়ীর নাচঘরে গানের আসর বসেছে ইতিমধ্যে একাধিক বার। সাধারণ তবল্‌চিরা ভাল সঙ্গত করতে পারে না। এক-কালে ঐ বিদ্যা আয়ত্ত করেছিলেন প্রিয়নাথ। তাই গানের আসরে তবল্‌চিকে সরিয়ে দিয়ে তিনি নিজেই বাঁয়াতবলা টেনে নিয়েছেন।

প্রতি পদক্ষেপে এখন কালিনাথ তাঁর পরামর্শদাতা, উপদেষ্টা। কালিনাথের কথা তাঁর কাছে বেদবাক্য। প্রিয়নাথের অর্থসঙ্কট কালিনাথের সহায়তায় আশ্চর্য্য সরল উপায়ে দূর হয়েছে বার বার।

একাধিকবার তিনি গেছেন কালিনাথের সঙ্গে তুলাপটির সেই মাড়োয়ারীর গদীতে। অল্প দু'চার কথা, ষ্ট্যাম্প-কাগজের উপর শুধু একটি দস্তখৎ। বাস, গোছা গোছা নোট নিয়ে পরমানন্দে প্রিয়নাথ ফিরেছেন। সুতরাং এ-হেন বন্ধু কালিনাথ যে তাঁর উপর দুরতিক্রম্য প্রভাব বিস্তার করবেন তাতে আর বিস্ময়ের স্থান কোথায়?

* * * * *

ম্লানমুখী কন্যাকে কাছে ডেকে ভবতারণ জিজ্ঞাসা করলেন—গিয়েছিলি ও বাড়ী?

কন্যা ঘাড় নাড়ল।

—বলেছিলি আসবার কথা?

—বলেছিলাম বাবা!

—কি বললে প্রিয়নাথ?

—বললেন, কাজকর্ম্মে বড্ড ব্যস্ত। সময় পেলেই আসবেন।

নিঃশ্বাস ফেলে ভবতারণ বললেন—সেই এক কথা। এমন হবে আশা করি নি। সুপ্রিয়র সঙ্গে দেখা হলে তাকে একবার আসতে বলিস তো মা।

প্রমীলা মাথা নাড়ল শুধু।

সন্ধ্যায় সুপ্রিয়র সঙ্গে দেখা হল প্রমীলার। ঘরের মধ্যে বিছানায় শুয়েছিল সুপ্রিয়। কী যেন ভাবছিল। প্রমীলাকে দেখে উঠে বসে বললে—এসো। এমন সময়ে যে?

ম্লান হেসে প্রমীলা বললে—কেন, আসতে নেই না কি?

—এ আবার কেমনতর কথা হ'ল! সুপ্রিয় প্রফুল্ল হবার চেষ্টা করলে।

—কী জানি! কপালে কি আছে তা কে জানে!

—হঠাৎ দার্শনিক হ'য়ে উঠলে যে। হেসে বললে সুপ্রিয়।

বীণা আছে। আছে তাতে তারের যোজনা, তবুও সুর তো বাজছে না! উভয়েই তা অনুভব করছে।

সুপ্রিয় সোজা হোয়ে বসল। গভীর কণ্ঠে বললে—অমন ম্লানমুখে থেকো না মিলা। আমি আজ-কালের মধ্যেই বাবাকে বল্‌ব।

প্রমীলা হাসল। বড় করুণ সে হাসি। বললে—কিন্তু সেইটেই

কি অতিবড় দুঃখের কথা নয়? একদিন যাঁর আগ্রহ আর স্নেহের অন্ত ছিল না, আজ তিনি কেন আমাদের এমন ক'রে দূরে সরিয়ে দিচ্ছেন, তার কারণ বুঝতে গিয়ে যে বুক কেঁপে উঠছে বার বার।

ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল সুপ্রিয়—মিথ্যে বল নি তুমি। কী অস্বস্তির মধ্যে যে দিন কাটাচ্ছি তা বলবার নয়। শনি ঢুকেছে আমাদের সুখের সংসারে। কিন্তু তাকে আমি তাড়াবো।

ব্যস্ত হোয়ে প্রমীলা বললে—না, না, রাগের বশে কোন কাজ করতে যেও না, তাতে হিতে বিপরীত হবে।

সুপ্রিয় চুপ করে রইল। মনে মনে সে যেন কি একটা সংকল্প অ াটতে লাগল।

ক্ষণেক নীরব থেকে প্রমীলা বললে—বাবা তোমায় ডেকেছেন।

ঘাড় নেড়ে সুপ্রিয় বললে—যাব।

প্রমীলা বললে—আমি এখন যাই।

—এসো।

* * * * *

কথায় কথায় সুপ্রিয়র বিবাহের কথা উঠল। কালিনাথ বললেন—অবশ্য তোমার ছেলে, তুমি যে ব্যবস্থা করবে তার ওপর কথা বলবার সঙ্গত অধিকার আমার নেই; কিন্তু তবুও বলব, আগড়পাড়ার মুখুজ্যে-পরিবারের প্রকাণ্ড বংশ-মর্য্যাদার কথা বিস্মৃত হবার নয় এবং তা যে নষ্ট হয় তাও কল্পনা করা যায় না। সেই বংশের ছেলে এবং তোমার ঐ এক ছেলে, হীরের টুকরো ছেলে,

তার বিয়ে হবে সমান ঘরে, তার পিতৃ-পিতামহের মর্য্যাদার সঙ্গে তাল রেখে, উপযুক্ত আড়ম্বরে, এইটেই সবাই আশা করে।

সকাল বেলায় যথারীতি দুই বন্ধু চায়ের টেবিলে বসেছিলেন। কথাটা কালিনাথই ওঠালেন প্রথম। সোৎসাহে বলতে লাগলেন—তোমার নিজের বিয়ের কথা ভোল নি নিশ্চয়ই। চৌষট্টি ঘোড়ার গাড়ীর সেই বিরাট শোভাযাত্রা, কনের বাড়ীর সামনের রাস্তায় মখমলের বাহার আর লক্‌নৌ-এর রসুনচৌকির সেই মন-মাতানো সুর! কী বিপুল সমারোহ হয়েছিল তা কি ভোলবার? তিন দিন ধরে উইল্‌সন্‌ হোটেলের ম্যানেজার খাবার পানীয় আর খানসামার দল সাপ্লাই করতে করতে হিমসিম খেয়ে গিয়েছিল। কলকাতার হেন বড় সাহেব আর মুচ্ছুদ্দি ছিল না যে ওই বাগানবাড়ীতে এসে গড়াগড়ি দিয়ে না গেছে।

কালিনাথের বাচনভঙ্গীতে প্রিয়নাথ হাসতে লাগলেন। বললেন—সে সব দিন গত হয়েছে বন্ধু! সুতরাং…

—সে দিন গত হয়েছে বটে, কিন্তু সে-বংশের মর্য্যাদা তো গত হয়নি। সেই বংশের ছেলের বিয়ে হবে শ্রীহীন ভাবে, কোন জলুশ থাকবে না তাতে, বিয়ে হবে নিতান্ত অসমান ঘরে, তা কল্পনা করতে কষ্ট লাগে বৈ কি। অবশ্যি, আগেই তো বলেছি, এ-সব ব্যাপারে তুমি যা বুঝবে, তার ওপর কথা বলা আমার সাজে না। কিন্তু তবুও যে বললাম তা তোমাকে অত্যন্ত ভালবাসি বলেই। অন্যায় যদি কিছু বলে থাকি…

—না, না, অন্যায় বলবে কেন! ব্যস্ত হলেন প্রিয়নাথ—কিন্তু…

এমন সময় ভৃত্য ভৈরব এসে জানালো, এক ব্যক্তি বাবুর দর্শনপ্রার্থ।

কালিনাথ বললেন—নিয়ে এসো তাঁকে।

ছাতা বগলে লাঠি হাতে এক প্রৌঢ় ব্যক্তি ঘরে ঢুকে অভূমি-প্রণত প্রণাম জানিয়ে দাঁড়াল।

জিজ্ঞাসুমুখে প্রিয়নাথ বললেন—কোথা থেকে আসছেন? বসুন।

অদূরে একখানা চৌকি ছিল। তার উপর ব'সে আগন্তুক বললে—আজ্ঞে, আমি আসছি গোবরডাঙা থেকে। আপনার ছেলের বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে এসেছি।

কালিনাথ প্রশ্ন করলেন—আপনি ঘটক?

ঘাড় নেড়ে আগন্তুক বললে—আজ্ঞে। আমার নাম হরিদাস, হরিদাস ভট্টাচার্য্য। অন্তত পাঁচশো বিয়ের ঘটকালি করেছি। অঘটন ঘটিয়েছি অনেক জায়গায়।

কালিনাথ হাসতে লাগলেন, বললেন—বটে! অঘটন-ঘটনকারী ঘটক! তা, এবারকার অঘটন ঘটন প্রচেষ্টার পটভূমিকা কি?

কালিনাথের কথার দাপটে হরিদাস ঘটক মিইয়ে গেল। প্রিয়নাথের মুখের পানে তাকিয়ে বললে—হুকুম করেন তো নিবেদন করি।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, বলুন না।

হরিদাস তখন সাহস পেয়ে জুৎসই হোয়ে বসল। তার কথায় জানা গেল, প্রিয়নাথের দান-ধ্যান এবং মহৎ অন্তঃকরণের পরিচয় জেনে এবং তাঁর একটি সুপুত্র আছে খবর পেয়ে গোবরডাঙার বনেদী জমিদার রায়বংশের বর্ত্তমান উত্তরাধিকারী তাঁর একমাত্র পরমাসুন্দরী

কন্যাকে প্রিয়নাথের হাতে অর্পণ করতে ইচ্ছুক হয়েছেন। প্রিয়নাথের বিরাট মর্য্যাদার কথা রায় মহাশয়ের অবিদিত নেই এবং তিনি সে মর্য্যাদার সম্মান রাখতে কার্পণ্য করবেন না। নগদ দেবেন পনেরো-বিশ হাজার, পঁচিশ পর্য্যন্ত পিছপাও হবেন না। তার সঙ্গে উপযুক্ত যৌতুকাদি এবং কন্যাকে একশো ভরির সোনা, জড়োয়া ইত্যাদি। এবং এই পর্য্যন্তই শেষ নয়। প্রিয়নাথ একটি হাসপাতাল নির্ম্মাণের যে মহৎ পরিকল্পনাকে কার্য্যকরী ক'রে তোলার চেষ্টায় ব্যাপৃত আছেন, সে-সংবাদও রায় মশায় জানেন এবং তিনি স্বেচ্ছায় পরম আনন্দে তাঁর সেই প্রচেষ্টায় সহায়তা করতে প্রস্তুত আছেন। প্রথম দফায় তিনি উক্ত হাসপাতাল-তহবিলে পঁচিশ হাজার টাকা দিতে ইচ্ছুক হয়েছেন।

লোভনীয় প্রস্তাব সন্দেহ নেই। ক্ষণেক নীরব থেকে প্রিয়নাথ কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন, কালিনাথ বাধা দিয়ে হরিদাস ঘটককে উদ্দেশ করে বললেন—পটভূমিকার চটক আছে তা মানতেই হবে। কিন্তু কি জানেন ঘটক মশাই, আমাদের এই মুখুজ্যে মহাশয় ব্যক্তিটি কিছু অন্য ধরণের। তিনি যা স্থির করবেন তার আর নড়চড় হবে না। অতএব আপনি আর-একদিন আসবেন।

—তা বেশ। তা বেশ। কবে আসবো ?

কালিনাথ বললেন—সন-তারিখ নির্ঘণ্ট করে বলতে পারছি না। ধরুন, সামনের সপ্তাহের যে-কোন দিন। কেমন? আচ্ছা, এখন তাহলে···হ্যাঁ, বিলক্ষণ, নমস্কার !

কালিনাথ এমন ভাবে তার দিকে তাকালেন যে হরিদাস ঘটক

আর কোন কথাই বলবার সাহস বা সুযোগ পেলে না। তাড়াতাড় উভয়কে নমস্কার করে প্রস্থান করলে।

প্রিয়নাথ হাসতে লাগলেন। মানুষকে এমন অপ্রস্তুত করতে পারে কালিনাথ! বেচারা ঘটক একেবারে নাজেহাল।

কালিনাথ বললেন—তা তো হল। ঘটককে বিদায় করলাম বটে, কিন্তু তার প্রস্তাবটাকে তো সরাসরি বিদায় দিতে পারছি না।

ঘাড় নেড়ে প্রিয়নাথ বললেন—খুব ভাল সম্বন্ধ, তাতে আর সন্দেহ কি ?

কালিনাথ যোগ করলেন—ভাল এবং যোগ্য। একেই বলে পালটি ঘর আর যোগ্যং যোগ্যেন যোজয়েৎ।

—কিন্তু…

—হ্যাঁ, তোমার 'কিন্তু' আমি জানি, প্রিয়! সেই জন্যেই তো কোন কথা বলছি না।

প্রিয়নাথ বললেন—তুমি তো জানই ভাই, সমস্ত ঠিক হোয়ে গেছে।

কালিনাথ জবাব দিলেন—সমস্ত ঠিক হোয়ে গেছে কি না জানিনে, তবে তুমি যে একটা কিছু স্থির করে রেখেছো তা জানি। যাক ও কথা। এখন চল, সেই কাজটা সেরে আসা যাক। ফতেলাল আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে।

* * * * *

সুপ্রিয়কে জন্মাতে দেখেছে অঘোর পাঠক। জ্ঞানলাভের পর থেকেই সুপ্রিয় দেখছে তাকে। অঘোর তার কাছে বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র।

সকাল বেলা একটা অত্যন্ত জরুরী কাজে বাড়ীতে এসে মনিবের দেখা না পেয়ে অঘোর প্রায় ব'সে পড়ল।

সুপ্রিয় বেরুচ্ছিল বাইরে। তাকে দেখে বললে—এই যে অঘোর কাকা! কখন এলেন?

অঘোর কিছুক্ষণ স্তব্ধ হোয়ে রইল। তারপর আপন মনে বললে—এই আমার শেষ চেষ্টা। দেখা যাক!

—শেষ চেষ্টা! সে আবার কি অঘোর কাকা?

—বলছি বাবা; চল, ঐ ঘরে বসি।

অঘোরের কথা শুনে সুপ্রিয় যেমন স্তম্ভিত তেমনি মর্ম্মাহত হল। এত দিনের এত বড় প্রতিষ্ঠান ডকে উঠতে বসেছে আর তার বাবা নিশ্চেষ্ট নির্ব্বিকার! হিসাব-পত্র দেখছেন কালিনাথ। টাকার লেন দেনও তাঁর হাতে। সর্বনাশের আর বাকি কি?

কিছুক্ষণ নীরব থেকে সুপ্রিয় বললে—আচ্ছা, অঘোর কাকা, আপনি এখন যান। আমি আজই বাবার সঙ্গে এবিষয়ে কথা বলব।

অঘোর বললে—বোলো। তুমি যদি অপিসে গিয়ে বসতে পারো তাহলে আমি এখনো হাল ধ'রে একে বাঁচাতে পারি। তা নাহলে শুধু ভস্মে ঘী ঢালা হবে। আর, বারে বারে টাকাই বা জোগাড় করব কোথা থেকে? একদিন ছিল যেদিন শুধু কর্ত্তার নাম করে লাখ টাকার ক্রেডিট পেয়েছি। কিন্তু কথার খেলাপ হয়েছে বার বার। তাই সেদিন আর নেই। তোমাকে সামনে পেলে আমি আবার সেই দিনকে ফিরিয়ে আনতে পারি। বিশ্বাস আছে নিজের ক্ষমতার ওপর। কিন্তু বিশ্বাস নেই শনিকে।

সুপ্রিয় বললে—আচ্ছা অঘোর কাকা, সব দেবতার শত্রু আছে। শনি ঠাকুরের এমন কোন প্রতিপক্ষ নেই যাকে কাজে লাগানো যেতে পারে?

মাথা নেড়ে অঘোর বললে—থাকলেও আমার জানা নেই বাবা।

—আচ্ছা, তাহলে ওই কথাই রইল। আপনি এখন আসুন। চলুন একসঙ্গেই বেরুই দু'জনে।

—তুমি এখন কোথায় যাবে বাবা?

সুপ্রিয় বললে—মহাপ্রস্থানের পথে অর্থাৎ উত্তরমুখো, দমদম বাজাকল। আপনার তো গঙ্গার দিকে পা? মানে, পশ্চিমমুখো, অর্থাৎ আপিসের দিকে?

অঘোর হেসে বললে—তাই বটে।

* * * *

সেদিন বিকালে কালিনাথ যখন প্রিয়নাথের কাছে আগামী বৈঠকের একটি মনোমুগ্ধকর প্রোগ্রাম পেশ করছিলেন সেই সময় সুপ্রিয় সেখানে উপস্থিত হল।

মুহূর্তে কথা বন্ধ করে কলিনাথ বললেন—এসো বাবা, এসো। এতক্ষণ তোমার কথাই হচ্ছিল। প্রিয়নাথকে তাই বলছিলাম যে বহু ভাগ্য থাকলে তবে এমন ছেলে মেলে। এমন রত্ন যখন পেয়েছ তখন আর কেন? তার হাতে সংসার আর ব্যবসাকর্ম্ম বুঝিয়ে দিয়ে বাকি দিন ক'টা নাম গেয়ে কাটাও।

বারেক কালিনাথের পানে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে সুপ্রিয় পিতার দিকে ফিরে বললে—একটা বিশেষ কথা বলবার ছিল, বাবা!

যে ভঙ্গিতে সুপ্রিয় এসে দাঁড়াল এবং কথা বললে তা প্রিয়নাথের কাছে একান্ত অপরিচিত ও অপ্রত্যাশিত। মুখ তুলে বললেন—বল।

সুপ্রিয় আবার কালিনাথের দিকে তাকালো। তিনি বললেন—বল বাবা, কি বলবে বল।

সুপ্রিয় তবুও মৌন রয়েছে দেখে প্রিয়নাথ বললেন—তোমার কালি-নাথ কাকার কাছে আমার কিছুই গোপন নেই সুপ্রিয়। সুতরাং অসঙ্কোচে তুমি বল।

সুপ্রিয় বললে—সারাজীবন ধ'রে আপনি অনেক পরিশ্রম করেছেন। বিশ্রাম নেবার সময় হয়েছে এবার। আপিসের কাজকর্ম্ম এখন থেকে আমি দেখব।

সুপ্রিয়র কথায় প্রিয়নাথ একই সঙ্গে মনের মধ্যে সূক্ষ্ম অভিমান ও চাপা আনন্দ অনুভব করলেন। বললেন—তা বেশ ত।

কালিনাথ ঘন ঘন মাথা দোলাতে লাগলেন আর বলতে লাগলেন—উপযুক্ত ছেলের মত কথাই বলেছ সুপ্রিয়! তবে এখনও সময় আসেনি প্রিয়নাথের বিশ্রাম নেবার। পাকা মাথা আর সাধা অভিজ্ঞতা নিয়ে তোমার বাবা যে-ভাবে নৌকোর হাল ধ'রে তাকে বাঁচিয়ে নিয়ে চলেছেন, সে-দক্ষতা তো তোমার এখনও হয়নি। কাজেই তোমার সম্বন্ধে প্রিয়নাথ যে ব্যবস্থা করে রেখেছেন তাকে অগ্রাহ্য করা তোমার উচিত হবে না বাবা!

ক্ষুব্ধ-বিস্ময়ে সুপ্রিয় বললে—অগ্রাহ্য তো করিনি। আমি বাবার এবং আপিসের সুবিধের জন্যেই বলছিলাম।

কালিনাথের কথায় প্রিয়নাথের আত্মাভিমান হঠাৎ মাথা চাড়া

দিয়ে উঠল। গম্ভীর কণ্ঠে বললেন—কালিনাথ ঠিকই বলেছেন। তুমি বরং আপিস অঞ্চলে তোমার নিজের আপিস খোলবার জন্যে একটা ঘর দেখ।

সুপ্রিয় বললে—কিন্তু আমি যে অঘোর বাবুকে বলে দিয়েছি যে কাল থেকে আমি আপিসের কাজ-কর্ম্ম দেখা-শোনা করবার জন্যে প্রত্যহ সেখানে যাব।

সুপ্রিয়র এই কথা শুনে প্রিয়নাথ কি যে বলবেন তা ভেবে না পেয়ে বোধ হয় বিমূঢ় বোধ করছিলেন, তাঁকে উদ্ধার করলেন কালিনাথ।

বললেন—কিন্তু তোমার এ ব্যবস্থা যে সম্পূর্ণ অনাবশ্যক বাবা!

—অনাবশ্যক কেন? প্রশ্ন করলে সুপ্রিয়।

ধীরে ধীরে কালিনাথ বললেন—অনাবশ্যক নয়? যেখানে খোদ কর্ত্তা নিজে প্রত্যহ আপিসে গিয়ে সমস্ত দেখাশোনা এবং বিলিব্যবস্থা করছেন, যেখানে তাঁর বিশ্বস্ত বন্ধুরূপে আমি আমার বহুদিনের অভিজ্ঞতা নিয়ে সমস্ত খাতাপত্র তন্নতন্ন করে দেখছি এবং বার বার বহু বাধা-বিঘ্নকে পার হতে সহায়তা করছি, যে স্থলে প্রিয়নাথ এবং আমি উভয়ে একযোগে কাজ ক'রে সঙ্কটকালে প্রতিষ্ঠানটিকে বাঁচিয়ে নিয়ে চলেছি, সে স্থলে তুমি যদি এসে ইন্টারফিয়ার করতে চাও তো তাকে অনাবশ্যক বলা বোধ করি অন্যায় হবে না। কি বল প্রিয়নাথ?

সজোরে ঘাড় নেড়ে প্রিয়নাথ বলে উঠলেন—নিশ্চয়, একশোবার। ডালহৌসী স্কোয়ারে ঘর নিয়ে তুমি তোমার নিজের আপিস খোলবার ব্যবস্থা কর।

ব্যাকুল কণ্ঠে সুপ্রিয় বললে—কিন্তু বাবা…

কালিনাথ বলে উঠলেন—বাপের কথা অগ্রাহ্য ক'র না সুপ্রিয়।

সুপ্রিয় আর নিজেকে সামলাতে পারলে না। রুক্ষ তিক্তকণ্ঠে বলে উঠল—কি যা-তা বকছেন আপনি তখন থেকে ?

বিস্মিত হলেন প্রিয়নাথ। বিরক্ত হলেন। তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে চড়া সুরে কথা বলেছে এমন লোককে তিনি কোন দিনই বরদাস্ত করতে পারেন নি। ছেলের বেলাতেও পারলেন না। শান্ত অথচ কঠিন কণ্ঠে বললেন—গুরুজনদের মান রেখে কথা বলার শিক্ষা আশা করি তুমি আর কখনও ভুলে যাবে না। এবারকার মতো তোমায় কিছু বললাম না।

ক্ষণেক নীরব থেকে পুনরায় বললেন—কালিনাথ যা-তা কিছু বলেন নি। অত্যন্ত সমীচীন কথাই বলেছেন। তোমার এখন আপিসে বেরুবার কোন দরকার নেই। আশা করি আমার কথা অমান্য করবে না। আর কিছু বলবার আছে ?

—না।

—তা হলে তুমি এখন যেতে পার।

বিহ্বল হতভম্বের মত সুপ্রিয় ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

মিনিট দুই অখণ্ড নীরবতায় কাটলো, তারপর কালিনাথ বড় একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন—কি জানি, হয়তো আমরাই ভুল করলাম। সুপ্রিয়র হাতে আপিসের সব ভার দিয়ে হয়ত আমাদের সরে আসাই উচিত ছিল।

সবেগে প্রিয়নাথ বললেন—পাগল না কি তুমি? এই দারুণ ডামাডোলের মধ্যে একদিনও চালাতে পারবে না। ভাল কথা, কাল

সকালে বারোটার মধ্যে হাজার দশেক পাওয়া যাবে তো? কি বলে মাড়োয়ারী?

ধীরে ধীরে কালিনাথ বললেন—হয়ত যাবে। অনেক ক'রে তো বলে রেখেছি। তবে প্রথমটার জন্যে তাগাদা করছিল। সময় অনেক দিন আগেই পার হয়ে গেছে; আর এ-সব লেন-দেনে সময় পার হওয়া যে খুবই বিপজ্জনক তাও নিশ্চয়ই তোমার অজানা নেই, তাই, মহাজনটিকে খুবই ভাল বলতে হবে, একবারের বেশি দু'বার বলে নি।

—দেব, দেব। সব একসঙ্গে মিটিয়ে দেব। বললেন প্রিয়নাথ।

কালিনাথ বললেন—কাল সব টাকাটা নিয়েই ফাটকা বাজার হয়ে মাঠে যাবে না কি?

মাথা নেড়ে প্রিয়নাথ জবাব দিলেন—নিশ্চয়। মারি তো গণ্ডার, লুটি তো ভাণ্ডার।

* * *

পশ্চিম আকাশে ঘনঘটার আভাস। দুরন্ত বায়ু খর বেগে বইতে শুরু করেছে। চারিদিক ছেয়েছে মেঘে। যে-তরণী পাল তুলে চলেছিল অনুকূল স্রোতে, তার হাল ভেঙেছে, পালের কাছি ছিন্ন হয়েছে। তরী বুঝি ডোবে।

কালিনাথ অত্যন্ত ব্যস্তভাবে ঘোরাঘুরি করছেন। আইনের অমোঘ বিধানকে তিনি নাকি অনেক কষ্টে ঠেকিয়ে রেখেছেন। আশ্বাস দিয়েছেন প্রিয়নাথকে, এ সঙ্কট তাঁরা পার হবেনই, কালিনাথ জীবিত থাকতে কোন মহাজনের সাধ্য নেই প্রিয়নাথের কেশাগ্র স্পর্শ

করে। প্রিয়নাথও একান্ত অসহায়ের মত কালিনাথের হাতে নিজেকে সম্পূর্ণ ভাবে ছেড়ে দিয়েছেন।

সেদিন সকালবেলা আর-এক দফা বন্ধুকে আশ্বাস দিয়ে কয়েক-খানা ডেমি কাগজে প্রিয়নাথের সই করিয়ে নিয়ে কালিনাথ বেরিয়ে গেলেন।

প্রিয়নাথ যথারীতি রওনা হলেন ফাটকা বাজারের দিকে।

*   *   *

গণ্ডার রইল অক্ষত। ভাণ্ডার রইল অলুণ্ঠিত। রিক্তহস্তে প্রিয়নাথ বাড়ী ফিরলেন।

কিন্তু টাকা তো চাই। টাকা। কোথায় কেমন করে পাওয়া যায়? এমন সময় জানা গেল হরিদাস ঘটক পাশের ঘরে এসে বসে আছে!

কালিনাথ বললেন—প্রস্তাবটা একেবারে উপেক্ষা করবার মতো নয় প্রিয়নাথ! টাকাটা আমি দেখছি না। আমি দেখছি বংশ-মর্য্যাদার দিকটা। তাছাড়া তোমার অত সাধের হাসপাতাল। তারও একটা কিনারা হয়।

তারপর নিম্ন স্বরে বললেন—ছেলে যে তোমার বিগড়ে যেতে বসেছে, সে কার প্ররোচনায় তা কি তুমি আজো বোঝ নি প্রিয়নাথ? তোমার বিষয়-সম্পত্তির ওপর লক্ষ্য আছে ওদের।

—কিন্তু আমি যে কথা দিয়েছি কালিনাথ!

কালিনাথ তাচ্ছিল্যের হাসি হাসলেন—কিসের কথা! কথা

দিয়েছো, বন্ধুর মেয়েকে সৎপাত্রে অর্পণ করবার ব্যবস্থা করবে। এই তো ?

—হ্যাঁ, কতকটা তাই বটে।

—বেশ। তাই কর না কেন? দেশে সৎপাত্রের অভাব নেই। দেখ-শুনে একটি স্থির করে দাও; দু'-পাঁচ হাজার তোমার খরচ হবে। তার আর উপায় কি! কথা যখন দিয়েছো।

প্রিয়নাথ চুপ ক'রে রইলেন। কালিনাথ বলতে লাগলেন—বন্ধুর জন্যে এতখানিই বা কে করে আজ-কালকার দিনে! এই যা করলে তুমি তা যথেষ্ট।

অন্য কোন প্রলোভন না হোক, পাত্রীপক্ষ তাঁর হাসপাতালকে সাহায্য করবে, তাদের সহায়তায় তাঁর বহুদিনের স্বপ্ন সম্পূর্ণ ও সার্থক হবে, এই আকর্ষণ প্রিয়নাথের মনে দুর্নিবার প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে। তা ছাড়া সমান ঘরে ছেলের বিয়ে দেবার ইচ্ছাটাও তো অসঙ্গত নয়। কিন্তু ভবতারণ আর প্রমীলা ?

সত্যিই কি প্রিয়নাথের বিষয়-সম্পত্তির প্রতি লুব্ধ হয়েছে ভবতারণ? তাই তার অত আগ্রহ, অত ত্বরা? প্রিয়নাথ দ্বিধায়, ইচ্ছাশক্তির অভাব-জনিত দুর্ব্বলতায় দুলতে লাগলেন।

—তাহলে ঘটককে বিদায় ক'রে দিই, কি বল ?

কালিনাথের কথায় প্রিয়নাথ সজাগ সোজা হোয়ে বসলেন। বললেন—তোমার কথাটা উড়িয়ে দেওয়া যায় না, তা ঠিক! কিন্তু আমি ভবতারণের কাছে গিয়ে কেমন করে বলব···

—তোমায় যেতে হবে কেন? বললেন কালিনাথ—যা বলবার

আমি গিয়ে তাঁকে বুঝিয়ে বলে আসবো। তিনি জ্ঞানী ব্যক্তি। নিজের স্বার্থের জন্যে নিশ্চয় তোমার সুবিধার প্রতি উদাসীন হবেন না। আমার বিশ্বাস, আমার কথা শুনলে, তিনি সানন্দে এবং স্বেচ্ছায় রাজী হবেন।

—তুমি আমায় নিশ্চিন্ত করলে। হাঁফ ছেড়ে প্রিয়নাথ বললেন —তাহলে ঘটককে বলে দাও, আসছে রবিবার তাঁরা যেন এসে কথা-বার্ত্তা পাকা করে যান।

হৃষ্টচিত্তে মাথা দোলাতে দোলাতে কালিনাথ পাশের ঘরে গিয়ে ব্যবস্থা পাকা করে এলেন।

* *

ভবতারণকে বুঝিয়ে বললেন কালিনাথ। বেশ ভাল করেই বুঝিয়ে বললেন। সেই দিনই সন্ধ্যার পর তিনি ভবতারণের বাড়ীতে পদার্পণ করলেন। তাঁকে দেখে সাগ্রহে ভবতারণ বললেন—আসুন, আসুন চৌধুরী মশায়! অনেক দিন পরে। বসুন।

একখানা হাতা-ভাঙ্গা চেয়ারের উপর বসে কালিনাথ স্মিতহাস্যে ভবতারণের মুখের পানে তাকালেন। অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় উৎসুক চোখ মেলে ভবতারণ বললেন—শরীর নিয়ে আর পারলাম না কালিনাথ বাবু, ক্রমেই এগিয়ে চলেছি। তারপর? খবর কি বলুন। প্রিয়নাথকে অনেক দিন দেখিনি।

ঈষৎ হেসে কালিনাথ বললেন—বড়লোক, তায় আবার ব্যবসায়ী মানুষ। সময় কোথায় বলুন? তার ওপর ও-সব মানুষের মেজাজের অন্ত পাওয়াও ভার।

কথার সুরটি যেন কেমন লাগল। ভাবতারণ বললেন—কাজ-কর্ম্মে খুব ব্যস্ত আছে বুঝি?

—শুধু কাজে কেন, নানা কারণেই ব্যস্ত। বললেন কালিনাথ—তা আমি বললাম, আমাকে আর এ-সব ব্যাপারে জড়াচ্ছ কেন প্রিয়নাথ? তোমার যা ইচ্ছে তা করবে, আমাকে নিমিত্তের ভাগী করে বিড়ম্বিত করা বৈ তো নয়।

দুর্ব্বোধ্য! ভবতারণ বললেন—কাজ-কর্ম্মে কিছু কি গোলমাল ঘটেছে?

মাথা নেড়ে কালিনাথ বললেন—ব্যবসায়ে একটু-আধটু গোলমাল তো লেগে থাকবেই। তা নয়। প্রিয়নাথ ছেলের বিয়ের ব্যবস্থা করেছেন। গোলমাল সেইখানে।

—সুপ্রিয়র বিয়ে! ভবতারণ বিস্মিত বিহ্বল হলেন—সে তো এক রকম...

মাথা দোলালেন কালিনাথ—আমি কতক কতক শুনেছি চক্রবর্ত্তী মশায়। কিন্তু ঐ যে বললাম। বড়মানুষ লোক, মেজাজের অন্ত পাওয়া ভার। গোবরডাঙ্গার জমিদারের মেয়ের সঙ্গে ছেলের বিয়ে ঠিক করেছেন! তারা নাকি লাখ টাকা খরচ করবে। আর মেয়েও নাকি অসামান্যা সুন্দরী।

আকাশ থেকে পড়লেন ভবতারণ। পতনের আঘাতে সর্ব্বাঙ্গ যেন চুরমার হয়ে গেল। রুদ্ধশ্বাসে বললেন—সে কি, এ যে অবিশ্বাস্য ব্যাপার!

মাথা নেড়ে মহাবিজ্ঞের মতো কালিনাথ বললেন—সংসারের লীলা এমনই বিচিত্র যে কখন্ কোন্‌টা বিশ্বাস্য আর আর কোন্‌টা অবিশ্বাস্য

তার হদিস পাওয়া অসম্ভব বললেও অত্যুক্তি হয় না ভবতারণ বাবু! বিয়ের সমস্তই ঠিক। এ ব্যবস্থার রদ হবে না এবং সেই কথাই আপনাকে বলবার জন্যে প্রিয়নাথ আমায় পাঠিয়েছে। কী মর্মান্তিক ভাবের অপ্রিয় কাজ বলুন তো? আমি বললাম, প্রিয়, আমাকে কেন, তুমি নিজেই গিয়ে বলে এসো, তাতে বললে, ভৈরবকে দিয়ে বলে পাঠালেও চল্‌ত, তবে তুমি ভাল করে বুঝিয়ে বলতে পারবে। তা, প্রিয়নাথের দয়া-মায়া আছে বৈ কি! শেষকালে আমায় বলে দিলে আপনাকে জানিয়ে দিতে যে আপনি মেয়ের জন্যে পাত্র স্থির করুন, দু'এক হাজার যা লাগে তা প্রিয়নাথ অবশ্যই দেবে, আপনাদের প্রতি তার স্নেহের কম্‌তি নেই।

ধীরে ধীরে শুয়ে পড়লেন ভবতারণ। জীবনে অনেক আঘাত, অনেক শোক পেয়েছেন, কিন্তু এতখানি বিমূঢ় আর বেদনাতুর কখনো বোধ করেননি। চারিদিকে এ কী ধূসর পাণ্ডুরতা! কালো আকাশের নীচে গোটা পৃথিবীটা কি এক মুহূর্ত্তে বেবাক লুপ্ত হয়ে গেছে?

কর্ত্তব্য সম্পাদন করে কালিনাথ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। বললেন—আপনি বেশী উতলা হবেন না ভবতারণ বাবু! ভগবান যা করেন ভালর জন্যেই।

ক্ষীণকণ্ঠে ভবতারণ ডাকলেন—প্রমীলা!

মেয়ে কাছে এসে দাঁড়াল। বললেন—বড় তেষ্টা পেয়েছে। জল দাও তো মা!

—আচ্ছা, ভবতারণ বাবু! তাহলে আমি এখন উঠি। নমস্কার! নারায়ণ, নারায়ণ!

বলতে বলতে কালিনাথ প্রস্থান করলেন।

—প্রমীলা!

—আমি পাশের ঘরেই ছিলাম বাবা। সব শুনেছি।

অকম্পিত কণ্ঠস্বর প্রমীলার। চোখের দৃষ্টিতে একটু বিহ্বলতা শুধু।

ভবতারণ পাগলের মতো স্খলিত স্বরে বললেন—এও কি সম্ভব! শেষকালে প্রিয়নাথ…

কথা শেষ করতে পারলেন না।

—বাবা।

—কি মা।

—চল, আমরা ধানবাদ ফিরে যাই।

ঘাড় নেড়ে ভবতারণ বললেন—ঠিক বলেছিস। আর এখানে একদিনও থাকা উচিত নয়। এখনি যোগেশকে চিঠি লিখে দে। না, না, চিঠি নয়। টেলিগ্রাম করে দে। কেমন?

—তাই দেব বাবা।

* * * * *

পরের দিন ভবতারণের গৃহে আবার দেখা দিলেন কালিনাথ। প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা উদ্দেশ্য বোধ করি।

বাইরে থেকে গলা খাঁকারি দিয়ে ডাকলেন—প্রমীলা মা কোথায় গো!

ডাক শুনে ঘরের ভিতর প্রমীলা চমকে উঠল। ভবতারণ বললেন—কে?

—কেমন আছেন? বলতে বলতে কালিনাথ ঘরে ঢুকলেন। উঠে দাঁড়িয়ে প্রমীলা বললে—বাবার শরীরটা ভাল নেই।

সমবেদনাসূচক কণ্ঠে কালিনাথ বললেন—ভাল না থাকারই তো কথা! মানুষের প্রতি মানুষের আচরণ যে এমন হতে পারে তা কি সহজে ভাবা যায়! কাল সারা রাত ঘুমুতে পারিনি।

কথা শেষ করে তিনি রুমাল দিয়ে মুখ মুছলেন।

ভবতারণ বললেন—আমরা বোধ হয় কালই চলে যাব, কালিনাথ বাবু! প্রিয়নাথকে বলে দেবেন, তার ওপর আমার বিন্দুমাত্র রাগ নেই। দুঃখ পেলাম বটে, সে আমার বরাত।

—কালই যাবেন বুঝি? কালিনাথ বললেন—হ্যাঁ, তা এখন যাওয়াই ভাল। আর এখানে থেকে লাভ কি? কিন্তু আপনার মতো এমন বন্ধুর প্রতি এতখানি অবিচার প্রিয়নাথ কেমন করে করল তা তো ভেবে পাই না। কি ক'রে সে বলতে পারলো যে তার বিষয়-সম্পত্তির ওপর আপনাদের লোভ। সেই জন্যেই...

প্রমীলা আর নিজেকে সামলাতে পারলে না। বললে—আপনি দয়া করে চুপ করুন! এ-সব আলোচনা শুনতে ভাল লাগছে না।

মহাদুঃখিত ভাবে কালিনাথ বললেন—কথাটা বলতে কি আমারই ভাল লাগল মা? থাক। নারায়ণ! আচ্ছা, আমি এখন চলি ভবতারণ বাবু। আবার কবে কোথায় দেখা হবে কে জানে। নমস্কার।

* * * * *

ভৈরবের মুখে কথাটা শুনে রাগে দুঃখে হতাশায় আর আতঙ্কে সুপ্রিয় অত্যন্ত দিশেহারা বোধ করতে লাগল।

বাড়ীতে ঘটকের আনাগোনা হচ্ছে। শুধু তাই নয়। তার বাবা অন্যত্র তার বিবাহের ব্যবস্থা করেছেন। পাকা কথাবার্ত্তা হয়ে গেছে। কিন্তু এও কি সম্ভব?

কোথায় যাবে? কি করবে সুপ্রিয়? প্রমীলা। কাল থেকে তার দেখা পায়নি। এই মুহূর্ত্তে তাকেই যে প্রয়োজন সব চেয়ে বেশী।

ভৈরব এসে জানাল—কর্ত্তাবাবু ডাকছেন।

—বাবা কোথায়?

—নীচের ঘরে।

—আর কে আছে সেখানে?

—যিনি থাকবার। ভৈরব বললে—কালিবাবু! যত নষ্টের মূল হচ্ছে ওই লোকটা, তোমায় বলে দিলাম খোকাবাবু।

—আচ্ছা, তুই যা। বলগে যা, আমি যাচ্ছি।

ভৈরব চলে গেল। সুপ্রিয় ঘরের মধ্যে পায়চারী করতে লাগল। মনে মনে সে তড়িৎ গতিতে অনেক কিছুই আলোচনা করে নিলে। প্রস্তুত করে নিলে নিজেকে। কালো দিকটা আগে থেকেই ভেবে নিলে। ভেবে নিলে প্রমীলাকে। সাহস নিলে মনে। তারপর ছোট টেবিলের উপর থেকে ফ্রেমে-বাঁধানো মায়ের ছোট ছবিখানি আর মনিব্যাগটা পকেটে নিলে। অনেক দিন থেকেই অসহ্য বোধ হচ্ছিল। আজ একটা হেস্তনেস্ত হতে পারে, এই ভেবে অনেকখানি স্বস্তি বোধ করলে।

নীচে নামল সুপ্রিয়।

তাকে দেখে কালিনাথ বললেন—এসো বাবা এসো। তোমার জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম।

তাঁর দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে সুপ্রিয় পিতাকে প্রশ্ন করলে—আমায় ডেকেছেন ?

মুখ তুলে প্রিয়নাথ বললেন—হ্যাঁ, তুমি এখন বেরুচ্ছো না কি ?

—হ্যাঁ।

—আচ্ছা। হ্যাঁ, শোন! কাল সকালে কোথাও বেরিও না। বাড়ীতে কয়েকজন ভদ্রলোক আসবেন।

—ও! কিন্তু আমাকে তাঁদের কি বিশেষ প্রয়োজন আছে ?

প্রিয়নাথ বললেন—আছে।

কালিনাথ স্মিতমুখে বললেন—এক পাত্রীপক্ষ তোমায় দেখতে আসবেন বাবা!

—সে কি!

মাথা দুলিয়ে কালিনাথ বললেন—মস্ত লোক তাঁরা। গোবর ডাঙার জমিদার। তোমার বাবা যে সেইখানেই তোমার বিয়ে স্থির করেছেন।

সুপ্রিয় প্রায় ফেটে পড়ল—অসম্ভব। হতে পারে না।

প্রিয়নাথ এইবার কথা বললেন। তাঁর ভিতরকার চিরকালের প্রভুত্বকামী শাসনপরায়ণ মনোবৃত্তি জেগে উঠেছে। বললেন—হতে পারে। সেই ব্যবস্থাই হয়েছে। সব দিক বিবেচনা করেই এই ব্যবস্থা করেছি।

—কি বলছেন বাবা! সুপ্রিয় বললে—আপনার মুখ থেকে এ কথা যে কোনদিন শুনতে হবে তা তো কল্পনাও করিনি।

কালিনাথ বললেন—কিন্তু তোমার বাবা তোমার ভালর জন্যেই···

—আপনি চুপ করুন। রীতিমতো ধমক দিয়ে উঠল সুপ্রিয়।

—সুপ্রিয়! গর্জে উঠ্লেন প্রিয়নাথ—গুরুজনদের সামনে ভদ্রভাবে কথা বলতে কি ভুলে গেছ নাকি? সেদিনও তুমি এমনি ভাবে কথা বলেছিলে ওঁর সঙ্গে। এর মানে কি? তুমি জানো, কালিনাথ শুধু আমার বন্ধুই নয়, আমার ভইএর মতো। তাঁর কোন অপমান আমি বরদাস্ত করব না।

—থাক, প্রিয়নাথ! উত্তেজিত হোয়ো না। ছেলেমানুষ। তাই কি বলতে কি বলেছে।

মাথা নেড়ে প্রিয়নাথ বললেন—না, এসব ছেলেমানুষি বুদ্ধি নয়। নিশ্চয় এর পেছনে কারও ওস্কানি আছে। কিন্তু কোন অন্যায় আমি সইব না। বাপের কোন অন্যায় আচরণ আমি প্রসন্ন-মনে গ্রহণ করিনি কোন দিন।

মাথা উঁচু করে সুপ্রিয় ধীরকণ্ঠে বললে—আপনারই তো ছেলে আমি, আমিও করব না।

—তার মানে?

সুপ্রিয় বললে—আমাদের জীবনের প্রতি আপনি যে অন্যায় আঘাত করতে চাইছেন, তা মানতে পারি না।

—আবার সেই এক কথা! অধীর হয়ে উঠলেন প্রিয়নাথ; প্রতি-রোধের আঘাত পেয়ে তিনি দুর্দ্দাম ভীষণ আকার ধারণ করলেন। উঠে দাঁড়ালেন। দু'চোখে তীব্র আগুন। বললেন—আমার কথা মানবে না তুমি?

—মানতে পারি না বাবা। কাতর কণ্ঠে বললে সুপ্রিয়।

—ভবতারণের মেয়ের সঙ্গে তোমার বিয়ে হবে না, বিয়ে হবে গোবরডাঙার জমিদারের মেয়ের সঙ্গে। এই আমার সংকল্প—এই আমার পণ।

—অসঙ্গত সংকল্প, অন্যায় পণ।—দৃপ্ত কণ্ঠ সুপ্রিয়র।

—শাট্ আপ্।

—হাঁ, হাঁ, কর কি, প্রিয়! কালিনাথ ব্যস্তভাবে দু'জনের মাঝখানে এসে দাঁড়ালেন।

—বোস, বোস, প্রিয়নাথ!

—না, কোন কথা শুনতে চাই না। কাঁপতে লাগলেন প্রিয়নাথ—আমার কথা শুনবে না তুমি?

ছেলের দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন।

মাথা নাড়লে সুপ্রিয়—শোনা সম্ভব নয়, বাবা।

সঙ্গে সঙ্গে প্রিয়নাথ বলে উঠলেন—তাহলে আজ থেকে তোমার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই। তোমাকে আমি পরিত্যাগ করলাম। এ বাড়ীতে তোমার স্থান নেই!

বজ্রপাত হল। কিন্তু দুমড়ে পড়ল না শমীশাখা। সে ছিল প্রস্তুত। তাই রইল স্থির নিষ্কম্প।

কালিনাথ হঠাৎ যেন ব্যাকুল হলেন—না, না, এ তুমি কি বলছ প্রিয়! মাথা ঠাণ্ডা কর। বাবা সুপ্রিয়…

—বোসো তুমি কালিনাথ। বাষ্পলেশহীনস্বরে প্রিয়নাগ বললেন—এই আমার শেষ কথা। অবাধ্য সন্তানের থাকার চেয়ে না থাকা ভাল।

সুপ্রিয়র দিকে তাকিয়ে বললেন—কিছু বলতে চাও ?

মাথা নেড়ে সুপ্রিয় বললে—না। আমি চললাম। যাবার সময় এই প্রার্থনা জানিয়ে যাচ্ছি, ভগবান আপনাকে শয়তানের হাত থেকে মুক্ত করুন।

সুপ্রিয় সোজা বেরিয়ে গেল।

কয়েক মুহূর্ত কাটলো নিশ্ছিদ্র নীরবতায়। তারপর যেন ঘুম থেকে জেগে উঠলেন প্রিয়নাথ। বললেন—সুপ্রিয় যে সত্যিই চলে গেল, কালিনাথ! তবে তুমি যে বলেছিলে, ও আমার কথা অগ্রাহ্য করতে সাহস করবে না।

সখেদে কালিনাথ বললেন—ছেলে হয়ে বাপের কথা এমনি করে অমান্য করবে, এমনি ভাবে বাপকে অপমান করবে তা তো ভাবতে পারিনি প্রিয়নাথ! যাই হোক, তুমি চিন্তিত হোয়ো না। দু'দিন চেপে থাকো, তাহলেই দেখবে, বাবাজীর সব গরম ঠাণ্ডা হয়ে গেছে এবং তোমার কাছে ফিরে এসেছে। বুঝতে পারছো না, পিছন থেকে যে আসকারা আছে।

অন্যমনস্কের মতো প্রিয়নাথ বললেন—কিন্তু আমি কি ভুল করলাম, কালিনাথ ?

—কখনোই নয়। অনেক দিক ভেবে অনেক গবেষণার পর তুমি যা স্থির করেছো তাতে যথেষ্ট বুদ্ধি আর দূরদর্শিতার পরিচয় আছে। না বুঝে সুপ্রিয় তোমায় আঘাত করে চলে গেল।

ধীরে ধীরে প্রিয়নাথ বললেন—ঠিক বলেছো তুমি। কিছু বুঝলে না। বুঝতে চাইলে না। গোঁ ভরে চলে গেল। যাক।

বুকের ভিতরটা যেন কেমন করতে লাগল প্রিয়নাথের। বললেন—তোমার সেই ওষুধটা আছে নাকি? দাও তো একটু। ভারী দুর্ব্বল বোধ করছি।

ব্যস্তভাবে কালিনাথ খাটের তলা থেকে স্যুটকেশ বার করে তার ভিতর থেকে একটি শিশি আর ছোট গেলাস বার করলেন। কবিরাজী ঔষধ আছে শিশিতে। তেজস্কর আর বলবর্দ্ধক। এক মাত্রা ঢেলে দিলেন বন্ধুকে।

ঔষধ খেয়ে মুখ মুছে প্রিয়নাথ বললেন—আমি ভুল করিনি। কি বল কালিনাথ?

—নিশ্চয় ভুল করোনি।

* * * * *

—তোমাকে স্মরণ ক'রে মনে জোর পেয়েছি, সাহস পেয়েছি, জমাট অন্ধকারের মধ্যে আলোর রেখা দেখেছি, অগ্রাহ্য করেছি বাপের অন্যায় অনুশাসন। কিন্তু তার বিনিময়ে এ কী শুনছি তোমার মুখে! আসবে না আমার সঙ্গে, অপেক্ষাও করবে না?

গৃহত্যাগ করে সুপ্রিয় এসেছে প্রমীলার কাছে। অসুস্থ ভবতারণ বাবু ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। তাই তাঁর সঙ্গে সুপ্রিয়র দেখা হবার সুযোগ হয়নি। ঘরের বাইরে লম্বা বারান্দার একান্তে দাঁড়িয়ে সুপ্রিয় আর প্রমীলার মধ্যে কথা হচ্ছিল।

—যাবে না আমার সঙ্গে? একদিন যে-গান গেয়ে শুনিয়েছিলে, 'পাড়ি দিতে নদী, হাল ভাঙে যদি, ছিন্ন পালের কাছি,' সে কি তবে মিথ্যে?

মনের ভাব আজ কিছুতেই কণামাত্র ব্যক্ত করা চলবে না। ছিঁড়ে ছিঁড়ে পড়ছে ভিতরটা। অসহ্য যন্ত্রণা! কিন্তু ভাব-লেশহীন মুখে কোন ছায়া নেই তার। নিষ্কম্প কণ্ঠে প্রমীলা বললে—সব কথা ভাল করে বুঝিয়ে বলতে পারবো না আজ। শুধু এই মাত্র বলতে পারি, নিজের স্বার্থ, নিজের সুখের চেয়ে আজ আমার কাছে বড় বাবার মান, অপমান, তাঁর বেদনা আর হতাশা। এ-সময় তাঁকে ছেড়ে যাওয়া তো সম্ভব নয় আমার পক্ষে।

—বেশ, তাহলে আমায় এই কথা দাও যে আমি ফিরে না আসা পর্য্যন্ত অবিচলিত থাকবে তুমি সকল অবস্থায়। আমার বাবা আমার সম্বন্ধে যে-ব্যবস্থা করে আজ আমায় এই অবস্থায় এনেছেন, তোমার বাবাও হয়ত সেই রকম ব্যবস্থা করবেন তোমার সম্বন্ধে। তার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে তোমায়।

—লাভ কি তাতে? তোমার আমার পথ আজ আর এক নয়। আমাকে ত্যাগ কর তুমি। ভুলে যাও।

কথা বলতে বলতে প্রমীলার চোখের পাতা কি কাঁপল? কৈ না তো। আশ্চর্য্য সংযম তার বাক্যে আর অভিব্যক্তিতে।

উত্তেজিত হল সুপ্রিয়—কি পাগলের মত বকছ! তোমার জন্যে আমি সর্ব্বস্ব ত্যাগ করে এলাম আর তোমার মুখে এই কথা! তাহলে আমার প্রতি তোমার কোন স্নেহ-ভালবাসা নেই, ছিল না

কোন দিন, অভিনয় করেছিলে আমার সঙ্গে এত দিন, এই কি আমাকে আজ মনে করতে হবে ?

মৃদুকণ্ঠে প্রমীলা জবাব দিলে—আশ্চর্য্য কি ? এখনো মানুষকে বিশ্বাস কর তুমি ?

সুপ্রিয় বললে—নিশ্চয় করি। তুমি আর আমাকে পরীক্ষা কোরো না। একেই তো অত্যন্ত বিহ্বল বোধ করছি, তার ওপর তুমিও যদি আজ এমন করে আঘাত দিয়ে কথা বল, তাহলে নিজেকে সামলানো দায় হবে।

ধীরে ধীরে প্রমীলা বললে—তুমি পুরুষমানুষ, তোমার অনেক পথ, অনেক ক্ষেত্র, অনেক সুযোগ প্রতি পদক্ষেপে, সুতরাং নিজেকে সামলে নিতে পারবে, পথ পাবে খুঁজে। সে-পথে আমাকে ডেকো না। তোমার জীবনে আমি নেই।

—কিন্তু কেন ? কি আমার অপরাধ ?

প্রমীলা জবাব দিলে—অপরাধ নয়। ভাগ্য। তোমার আমার সার্থকতার কথাটাই আজ শুধু ভাবলে চলবে না। বাপের অপমান আর দুঃখ, সেটা ভোলা কি সহজ ? তাঁর মুখ চাইতে হবে আমায়, নিজের সুবিধাকে বলিদান দিয়ে। এই কথটা বুঝতে পারছো না কেন ? অকারণে যে-অপমান তাঁকে সইতে হল সে তো আমার জন্যেই, তাই আমার জীবন দিয়ে তাঁকে যতটা পারি সান্ত্বনা দিতে হবে বৈকি।

কয়েক মুহূর্ত্ত নীরব থেকে সুপ্রিয় বললে—সব কথাই তোমায় বললাম। শয়তান কালিনাথ যা বলে গেছে, নিশ্চয় জেনো, তার

সব কথাই বাবার নিজের কথা নয়। যাই হোক, সর্বস্ব রিক্ত হয়ে আজ পথে বেরিয়েছি, একান্ত অপরিচিত পথে অনির্দেশ্য যাত্রা শুরু হল, কেন জ্ঞান নেই, নেই কোন অভিজ্ঞতা, কোথায় কী ভাবে যে এ যাত্রার পরিণতি ঘটবে তাও জানি না। বিশ্বব্যাপী অন্ধকারের মধ্যে যে আলোর শিখা ছিল, তাও আজ নিব্ল।

হাতের কাছে লোহার থামটা প্রমীলা শক্ত করে চেপে ধরল। মাথার মধ্যে ঝিমঝিম শব্দ হচ্ছে। আর কিছুক্ষণ কি নিজেকে সামলাতে পারবে না সে?

—চললাম তাহলে। সুপ্রিয় বললে—তাহলে এই কি তোমার শেষ কথা?

গলার মধ্যে কুণ্ডলী পাকাচ্ছে, কেন রকমে কণ্ঠস্বর পরিষ্কার করে নিয়ে প্রমীলা বললে—শেষ কথা কি না জানি নে। কিন্তু আজ আর অন্য কথাও কিছু বলবার নেই। মনের মধ্যে যেখানে অপমানের আঘাত আর গ্লানি, দুঃখে-বেদনায় অন্তর যেখানে ছত্রখান, সেখানে মিলনের বাঁশী বাজবে বেসুরো, সে মিলন সুখের বা কল্যাণের হবে না।

প্রমীলা স্তব্ধ হল। কয়েক মুহূর্ত্ত কাটল, তারপর নিঃশ্বাস চেপে সুপ্রিয় বললে—চললাম।

অস্ফুটে প্রমীলা—এসো।

চলে গেল সুপ্রিয়।

*   *   *   *   *

বাগানবাড়ীর নাচঘরের দরজা আবার খোলা হয়েছে। প্রিয়নাথকে আনন্দ দেবার উদ্দেশ্যে কালিনাথ গান-বাজনার আয়োজন করেছেন।

দু'দিন ধরে অসহ্য অস্থিরতার মধ্যে প্রতি মুহূর্ত যাপন করেছেন প্রিয়নাথ। কালিনাথ পাশে থেকে তাঁকে সান্ত্বনা আর স্তোকবাক্য দিয়ে ভোলাবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তাঁর চেষ্টা সফল হয়নি। স্তব্ধ ও নির্ব্বাক প্রিয়নাথ। দৃষ্টি বিহ্বল, কাতর।

কালিনাথের ভয় ছিল হয়ত আজকের এ আয়োজনে সম্মতি দেবেন না তিনি। কিন্তু সহজেই রাজী হয়েছেন। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই দুই বন্ধুতে বাগানবাড়ীতে উপস্থিত হলেন।

মালিটা ছুটি নিয়ে বাড়ী গেছে। বাগানবাড়ীর চাবী এখন কালিনাথের হেপাজতে। চাবী খুলে কালিনাথ বন্ধুকে ভিতরে নিয়ে গিয়ে বসলেন।

প্রিয়নাথের দুই চোখের দৃষ্টি কেমন যেন ঘোলাটে দূরপ্রসারী। ফরাসের এক পাশে তাকিয়ার উপর হেলান দিয়ে বসলেন। বললেন—কখন আসবে সব ?

কালিনাথ বললেন—সন্ধ্যা হোক। তারপর।

আর কোন কথা হল না। কালিনাথ একবার বাইরে গিয়ে দাঁড়াচ্ছেন, আর একবার ভিতরে ঢুকে প্রিয়নাথকে লক্ষ্য করছেন।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হল। কালো ছায়া নামল বাগানবাড়ীর সর্ব্বাঙ্গ ঘিরে। কালো এবং করাল ছায়া।

প্রিয়নাথ বললেন—কই, কেউ তো আসছে না।

—আসবে না। দৃঢ় কণ্ঠ কালিনাথের।

—আসবে না! তার মানে? গান নাচ? প্রিয়নাথ দু'চোখ মেলে তাকালেন।

—হবে না কিছুই। বললেন কালিনাথ—নাচ-গানের জন্যে আজ তোমায় এখানে আনিনি।

—তবে কিসের জন্যে এনেছো?

প্রিয়নাথের কথার উত্তরে কালিনাথ বললেন—এনেছি তোমায় আমার শেষ কথা শুনিয়ে যাব বলে?

—তোমার শেষ কথা?

মাথা দুলিয়ে কালিনাথ বললেন—হ্যাঁ, আমার শেষ কথা। বলবার সময় হয়েছে আজ।

—তাহলে বল।

—শোন প্রিয়নাথ! বলতে আরম্ভ করলেন কালিনাথ—দীর্ঘ পঁচিশ বছর পরে আমি তোমার কাছে এসেছিলাম কেন, তা কি তুমি জান?

মাথা হেলিয়ে প্রিয়নাথ বললেন—জানি বন্ধু। আমার সর্ব্বনাশ করতে। আমার পিতৃপুরুষের অন্যায়ের প্রতিশোধ নিতে। কেমন, ঠিক নয়?

—ঠিক! কালিনাথ বিকৃত কণ্ঠে হেসে উঠলেন—তোমার বুদ্ধি তাহলে একেবারে লোপ পায়নি! জানো কি তুমি, কি করেছি তোমার? তোমার ছেলেকে ঘর-ছাড়া করেছি আমি, তোমার সকল আশায়, সকল সুখে আগুন লাগিয়েছি আমি, তোমার মান-সম্ভ্রম-প্রতিপত্তি সমূলে নষ্ট করেছি আমি।

—জানি বৈকি।

কালিনাথ বলতে লাগলেন—তোমাকে তিলে তিলে ধ্বংস করেছি আমি, তোমার সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি কাল-পরশুর মধ্যেই ক্রোক হয়ে যাবে, তার মূলে আছি আমি। এর পর তোমার আর দাঁড়াবার ঠাঁইটুকু পর্য্যন্ত থাকবে না। জান কি তুমি ?

সোজা হয়ে বসে রুদ্ধশ্বাসে প্রিয়নাথ বললেন—জানি। সব জানি।

চোখে-মুখে এক অদ্ভুত হাসি ফুটিয়ে কালিনাথ বসলেন প্রিয়নাথের পাশে। স্বরূপ-মূর্ত্তিতে উদ্ঘাটিত হয়েছে শয়তান। বিকৃত কণ্ঠস্বরে আর বীভৎস হাসিতে বিষ ঝরে পড়ছে।

—হা, হা, হা, হা।

কালিনাথ হাসছেন। অপরিমিত বিষাক্ত হাসি। দু'চোখ জ্বলছে। সাপের মতো দেহটা দুলছে।

—আজ আমি সার্থক। আমার বেঁচে থাকা সফল হল। পিতৃলোকের তর্পণ সম্পূর্ণ হল আমার। পথের ধুলোয় লুটিয়েছে মুখুজ্যে বংশের অহঙ্কার আর মহিমা। সর্ব্বস্বান্ত আর হতমান হয়েছে প্রবল-প্রতাপ অত্যাচারী জমিদার প্রমথনাথের পুত্র প্রিয়নাথ। কিন্তু আর একটু বাকী আছে। আমার আনন্দ সম্পূর্ণ হতে আর একটু বাকী আছে। কিসে আমার আনন্দ চরম হবে তা জানো কি তুমি ?

—না, তা তো জানি না। স্থির নেত্রে চেয়ে আছেন প্রিয়নাথ।

কালিনাথের কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হল—আমার আনন্দ নিঃশেষে চরিতার্থ হবে সেই দিন, যেদিন দেখবো, প্রমথনাথের ছেলে প্রিয়নাথ, পথের ভিখারীর মতো রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে, ছেঁড়া কাপড়, জুতো

নেই পারে, একমুষ্টি অন্নের জন্যে এ-দুয়ার থেকে ও-দুয়ারে যাতায়াত করছে, পেটের জ্বালায় রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে কাতর কণ্ঠে ভিক্ষা করছে, দূর থেকে দাঁড়িয়ে সেই দৃশ্য যেদিন দেখবো সেদিন আমার আনন্দের পাত্র কানায় কানায় পূর্ণ হবে। কবে দেখবো ? কবে দেখবো ?

হঠাৎ শির-শির করতে লাগল প্রিয়নাথের সর্ব্বশরীর। দেহের সমস্ত রক্ত কি মাথায় উঠেছে ? ব্রহ্মতালুর মধ্যে কি আগুন ধরেছে ? এক মুহূর্ত্তে আত্মবিস্মৃত হলেন তিনি। যাকে বলে সাময়িক উন্মত্ততা, তাই গ্রাস করল তাঁকে। প্রতি রোমকূপ দিয়ে আগুনের প্রবাহ ছুটল।

—দেখবে, তুমি দেখবে ? বলতে বলতে ঝাঁপিয়ে পড়লেন কালিনাথের উপর।

প্রিয়নাথ হৃষ্ট-পুষ্ট বলিষ্ঠ। আর সে-তুলনায় কালিনাথ কৃশ ও দুর্ব্বল। সংঘাতের দুর্দ্দমনীয় বেগ সামলাতে পারলেন না, ধরাশায়ী হলেন।

—দেখবে ? তুমি দেখবে ?

বাঁ হাতে কালিনাথের গলা চেপে ধরেছেন প্রিয়নাথ, আর পাগলের মতো বলছেন—দেখবে ? তুমি দেখবে ?

কালিনাথের দুই চোখে আতঙ্ক ফুটে উঠল—কী করছ ! মারবে নাকি আমায় ?

—দেখবে ? তুমি দেখবে ? ক্ষেপে গেছেন প্রিয়নাথ। সামনে, নীচু টেবিলের উপর বসানো ছিল ভারী একটা ব্রোঞ্জের ড্রাগনমূর্ত্তি। দুহাতে সেটা টেনে নিয়ে কালিনাথের মাথার উপর উঁচিয়ে ধরলেন।

—দেখবে ? তুমি দেখবে ? তবে দেখ, দেখ, দেখ ! কথার সঙ্গে সঙ্গে সজোরে আঘাত করতে লাগলেন কালিনাথের মাথায় বুকে সর্ব্বাঙ্গে।

প্রলয় ঘটে গেল কয়েক নিমেষে। দু'-চারবার আর্ত্তনাদ করলেন কালিনাথ। সমস্ত শরীর ধনুকের মতো বেঁকে গেল। তারপর সব স্থির নিস্পন্দ।

সম্বিত ফিরে এল। উত্তেজনা প্রশমিত হল। হাতের ভারী পদার্থটাকে ফেলে কালিনাথকে চেপে ধরলেন প্রিয়নাথ। এ কী করলেন তিনি ? কালিনাথ, কালিনাথ ! কিন্তু সাড়া দেবে কে ? প্রাণহীন দেহ, নিথর নিস্তেজ !

প্রিয়নাথ কাঁপতে লাগলেন। খুন করলেন অবশেষে ? বিষয়-সম্পত্তি গেল, মান-ইজ্জত গেল, এইবার তাঁকে খুনী আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে।

শিউরে উঠলেন। অসহ্য লাগছে ভাবতে। কাঁপতে লাগল সর্ব্বাঙ্গ। মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্য্যন্ত। মহাভয় গ্রাস করল তাঁর সমস্ত সত্তা। এ অবস্থায় লোকালয়ে নিজেকে প্রকাশ করতে পারবেন না। তা হলে কি করবেন ?

পালাতে হবে। লোকালয় থেকে দূরে, বহু দূরে। তারপর পৃথিবী থেকে। পালাতে হবে, এই চিন্তাই তাঁকে আচ্ছন্ন করল। পালাও। পালাও। যেদিকে দু'চোখ যায়।

রাত্রির অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে চললেন, ক্ষণে ক্ষণে চমকে উঠতে লাগলেন। [চোখের দৃষ্টিতে অপরিসীম বিহ্বলতার ছায়া।

অদূরে লোক দেখে চমকে উঠছেন। সরে দাঁড়াচ্ছেন গাছের তলায়। ওই বুঝি কেউ এসে ধরল তাঁকে। দূরে কে যেন কাকে কি বললে। অমনি সন্ত্রস্ত চকিত হলেন। তাঁকে উদ্দেশ করেই বোধ হয় বলছে।

রাস্তা পার হয়ে দ্রুত সরু গলির মধ্যে ঢুকে পড়লেন। সেখানেও নিস্তার নেই। একজন গর্জ্জন করে উঠল—দাঁড়াও পলাতক। কাঁপতে কাঁপতে সরে দাঁড়ালেন। রেডিওয় অভিনয় হচ্ছে। তাহলে তাঁকে কেউ কিছু বলছে না? ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল। সে-রাস্তা পার হয়ে আর-একটা বড় রাস্তায় পড়লেন। অদূরে দেওয়ালের গায়ে দপ-দপ করে লাল আলো জ্বলছে নিবছে। আলোর লেখা ফুটে উঠছে—হত্যাকারী কে? দু'চোখ বিস্ফারিত করলেন। এরই মধ্যে কি সবাই জেনেছে? না। ওটা সিনেমা। ছবির বিজ্ঞাপন।

রাত্রি গভীর হতে গভীরতর হল। ক্লান্ত পদ শ্লথ হল প্রিয়নাথের। কিন্তু থামবার সাহস নেই। চলতে লাগলেন অবিরাম।

* * * * *

পরের দিন অতিবাহিত হল। তার পরদিন সংবাদপত্রে খবর বার হল: "বরানগরে রহস্যজনক হত্যাকাণ্ড।

"গত পরশ্ব রাত্রে বরাহনগর অঞ্চলের এক বাগান বাড়ীতে এক শোচনীয় হত্যাকাণ্ডের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। জানা গিয়াছে যে উক্ত বাগানবাড়ীর মালি গত পরশ্ব রাত্রে বাগানবাড়ীতে অনুপস্থিত ছিল। গতকাল সকালে কার্যে আসিয়া সে দেখিতে পায়, বাগানবাড়ীর মালিকের বন্ধু কালিনাথ চৌধুরী নামে এক ভদ্রলোক

মৃত অবস্থায় ঘরের মধ্যে পড়িয়া আছেন। মালি সেই দৃশ্য দেখিয়া তৎক্ষণাৎ স্থানীয় ফাঁড়ীতে সংবাদ দেয়। অনুসন্ধানে জানা যায়, বাগান-বাড়ীর মালিক হইতেছেন উত্তর কলিকাতার স্বনামখ্যাত ব্যবসায়ী ও দানবীর শ্রীপ্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়। তাঁহার বাড়ীতে ও কর্ম্মস্থলে সংবাদ লইয়া জানা যায়, তাঁহার পুত্র কিছুদিন যাবৎ কার্য্য-ব্যপদেশে কলিকাতার বাহিরে আছেন এবং তিনিও তিন দিন পূর্ব্বে পাট কেনা-বেচার কাজে মফঃস্বলে গিয়াছেন। তাঁহার কর্ম্মস্থলের প্রধান কর্ম্মচারী জানান যে উক্ত নিহত কালিনাথ চৌধুরী প্রিয়নাথ বাবুর বিশেষ পরিচিত ছিলেন এবং কয়েক দিন আগে কলিকাতায় আসিয়া প্রিয়নাথ বাবুর আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহাও জানা যায় যে, কালিনাথ বাবু প্রায়শই উক্ত বাগানবাড়ীতে রাত্রি-যাপন করিতেন। কালিনাথবাবুর ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে আর বিশেষ কোন তথ্য এখনও জানা যায় নাই। দেখিয়া শুনিয়া মনে হয়, নিহত ব্যক্তির কোন শত্রু অতর্কিতে তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া কোন ভারী পদার্থের দ্বারা আঘাত করিয়া তাঁহাকে হত্যা করে। ইহা চুরী বা ডাকাতি-জনিত হত্যা নহে। জোর পুলিশ তদন্ত চলিতেছে।”

*　　*　　*　　*　　*

পরনের লম্বা কোট ঘামে ও ধূলায় মলিন। অনভ্যস্ত পথ হাঁটার ক্লান্তিতে দুই হাঁটু ভেঙে পড়ছে। পকেটে মনিব্যাগের মধ্যে সামান্য অর্থ আছে। কিন্তু কোন দোকানের সুমুখে গিয়ে দাঁড়াবার সাহস নেই। অর্দ্ধমৃত আচ্ছন্নের মতো প্রিয়নাথ ধুঁকতে ধুঁকতে চলেছেন।

রুক্ষ চুল। শুষ্ক মুখ। খোঁচা খোঁচা দাড়িতে আকীর্ণ গণ্ডদেশ। এমনি করে আর কত দূর? পেরিয়ে এসেছেন অনেক পথ। ছোট বড় অনেকগুলি রেল-ষ্টেশন, ছোট-বড় সেতু, প্রসারিত মাঠ আর দিগন্তবিস্তীর্ণ ধানক্ষেতের পাশ দিয়ে পথ অতিক্রম করেছেন, পথ হেঁটেছেন ছোট-বড় গ্রামের ভিতর দিয়ে, অনেকগুলি লোকালয় আর জনপদ পিছনে ফেলে এসেছেন।

ছোট একটি ভাঙ্গা মন্দির। তার শূন্য অঙ্গনে কোন পুণ্যলোভীর ভীড় নেই। নির্জ্জন স্থানটিকে ঘিরে একটি অপার্থিব নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে। বিশ্রাম নেবার উপযুক্ত স্থান। ধীরে ধীরে প্রিয়নাথ এগিয়ে গিয়ে মন্দিরের একটা ভাঙ্গা পৈঠার উপর বসলেন।

গাছের মাথায় মাথায় সূর্য্যাস্তের শেষ রক্তিমাভা মিলিয়ে যাচ্ছে। পাখীরা বাসায় ফিরছে। দূরে মেঠো রাস্তায় গোরুর গাড়ী চলেছে ঘরমুখো। তার চাকার বিচিত্র কর্কশ শব্দের রেশ বহু দূর থেকে ভেসে আসছে।

হঠাৎ পিছন থেকে কে যেন বলে উঠল—Here comes another!

চম্‌কে শিউরে উঠলেন প্রিয়নাথ। ধরা পড়ে গেছেন। আর নিস্তার নেই। কাঁপতে লাগলেন।

একগাদা ইটের স্তূপের আড়াল থেকে লোকটি এগিয়ে এল। হাসলে হা হা ক'রে। তারপর বলে উঠল—"Angels & ministers of grace defend us. Be thou a spirit of heaven or goblin damned, be thy intents wicked or chari-

table thou come'st in such a questionable shape, that I will speak to thee!" কী মশায়, কেমন আছেন? আজকের বাজার-দর কেমন? তেজী না বন্দি?

প্রিয়নাথ লোকটির পানে তাকিয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। একটা পাগল। কিন্তু কী বিশুদ্ধ ইংরেজী উচ্চারণ! লোকটা যে বিশেষ শিক্ষিত তাতে সন্দেহ নেই।

—কী ভাবছেন? পাগল বললে—The flesh is weak! Way of all flesh! How does your patient doctor? "Can'st thou not minister to a mind diseased, pluck from the memory a rooted sorrow?" "হে ভিষক! পারো নাকি মনোব্যাধি করিতে মোচন? স্মৃতি হোতে উখাড়িতে নারো কি হে তুমি, দুরন্ত সন্তাপ বদ্ধমূল?"

প্রিয়নাথ নীরব। অদূরে দাঁড়িয়ে লোকটা হাত-পা নাড়ছে আর ব'কে চলেছে। আবছা অন্ধকারে তার মুখ দেখা যাচ্ছে না।

বক্‌তে বক্‌তে হাসতে হাসতে পাগলটা মন্দিরের পিছন দিকে চলে গেল। প্রিয়নাথ মুখ ফিরিয়ে সামনের দিকে দৃষ্টিপাত করলেন। এবং সঙ্গে সঙ্গে দারুণ বিস্ময়ে আর উৎকণ্ঠায় বিচলিত হলেন।

রাস্তার ওপারে একটা টীনের-চালাওলা বড় দোতলা মাঠকোঠায় আগুন লেগেছে। লোকজনের চীৎকার শোনা যাচ্ছে। শিশুর কান্না আর স্ত্রীলোকের আর্ত্তনাদ।

নীচেকার একটা জানলা-খোলা ছোট কুঠরির ভিতরটা দেখা যাচ্ছে। একটি শিশু জানলার গরাদ ধ'রে কাঁদছে। তার চারদিকে আগুনের শিখা!

কী সর্ব্বনাশ! বাচ্ছাটা যে এখনি পুড়ে মরবে! লোকজন চেঁচাচ্ছে বটে, কিন্তু কেউ তাকে রক্ষা করতে অগ্রসর হচ্ছে না! অথবা, ঘরটা এক টেরে বলে ছেলেটার অবস্থা কেউ জানতে পারেনি?

প্রিয়নাথ আর স্থির থাকতে পারলেন না। পরনের লম্বা কোটটা খুলে ফেলে পৈঠার উপর রাখলেন। তারপর দ্রুত অগ্রসর হলেন আগুনের দিকে।

চারদিকে অসহনীয় উত্তাপ। ঝলসে যাচ্ছে গা হাত পা। কোন রকমে জানলার গরাদ ভেঙে ছেলেটাকে বার করে নিয়ে এলেন প্রিয়নাথ। তাকে আগুনের আঁচ থেকে বাঁচাতে গিয়ে নিজের বাঁ কাঁধ এবং মুখের বাঁ দিকটা রীতিমতো ঝলসে গেল। হাঁপাতে হাঁপাতে ছেলেটাকে ফাঁকা জায়গায় এনে নামালেন। ছুটে এলো তার মা। লোকজন ছুটে এলো। জয়ধ্বনি করলো সবাই।

এদিকে পাগলটা এক কাণ্ড ক'রে বসল। প্রিয়নাথের প্রস্থানের পর আবার তাকে দেখা গেল। প্রিয়নাথ মন্দিরের পাদদেশে যেখানে বসেছিলেন, বকতে বকতে সে সেখানে এসে দাঁড়াল, তাঁর পরিত্যক্ত কোটটার প্রতি দৃষ্টি পড়ল। তুলে নিলে সেটা। তারপর প'রে নিলে। কোট প'রে লোকটা মহা খুসী। এদিক ওদিক তাকালো। অদূরে আগুন জ্বলছে। মাঠকোঠাটা পুড়ছে। হঠাৎ পাগলটা উল্লাসধ্বনি ক'রে সেই আগুনের দিকে ধাবিত হল।

—কে যায়? কে যায়? প্রিয়নাথ এগিয়ে গেলেন খানিকটা। কিন্তু পাগল তখন ধোঁয়া আর আগুনের মধ্যে অদৃশ্য হয়েছে।

সহসা মড়-মড় শব্দে মাঠকোঠার দোতলাটা ভেঙে পড়ল। ভেঙে পড়ল একেবারে পাগলটার মাথায়। মোটা কাঠের একটা গুঁড়ির আঘাতে তার বুক, মাথা আর মুখ থেঁতলে চেপ্টে গেল।

—পুলিশ এসে গেছে। কে একজন বললে। সঙ্গে সঙ্গে চমকে আঁতকে উঠলেন প্রিয়নাথ। লোকজনের পাশ কাটিয়ে দ্রুত পা চালালেন।

অযাত্রা-পথ-যাত্রা আবার শুরু হল।

*   *   *   *   *

একটি যাত্রী-বিরল রেল-ষ্টেশন। এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে প্রিয়নাথ চলেছেন সেই ষ্টেশনের সামনে দিয়ে। নগ্ন পদ, ছিন্ন বাস, মুখের বাঁ দিকটায় আগুনে পোড়ার কালো দাগ। ব্যথাতুর করুণ দুই চোখের দৃষ্টি। মলিন অপরিচ্ছন্ন ক্লিষ্ট ক্লান্ত চেহারা। এক গাল দাড়ি। রুক্ষ চুলগুলো ঝুলে পড়েছে। চেনা যায় না।

ট্রেন থেমেছিল। চলে গেল বাঁশী বাজিয়ে। একজন যাত্রী নেমেছিল। এক হাতে তার স্যুটকেশ। অন্য হাতে বেডিং। প্লাটফর্ম পার হয়ে রাস্তায় এসে লোকটি কুলি খুঁজতে লাগল। সামনে চলেছেন প্রিয়নাথ। তাঁকে দেখে লোকটি হাঁক্‌ল—এই কুলি। ইধর আও।

থমকে দাঁড়ালেন প্রিয়নাথ। লোকটির দিকে তাকালেন। অধীর ভাবে যাত্রীটি বললে—দেখতা কেয়া? আও ইধর। সামান উঠাও। চলো ডাকবাংলো।

এক মুহূর্ত্ত কি ভাবলেন প্রিয়নাথ। তারপর ধীরে ধীরে এগিয়ে গিয়ে বিছানার মোটটা মাথায় তুলে নিলেন। হাতে নিলেন স্যুটকেশ। শুরু হল নূতন জীবন। কুলি।

॥ পথের শেষ ॥

এক বছর পরে এই আখ্যায়িকার যবনিকা আবার উঠল। দেখা পেলাম সুপ্রিয়র।

বোম্বাই। কলকাতা ছেড়ে সুপ্রিয় সোজা বোম্বাই চলে আসে। সেখানে ছিল তার এক সতীর্থ ও বন্ধু, পরিমল। সরকারী কাজে পরিমলের বাবা থাকতেন বোম্বাই-এ। ইতিপূর্ব্বে একবার সুপ্রিয় বোম্বাই বেড়িয়ে গেছে। পথে নেমে পরিমলকেই স্মরণ করে সুপ্রিয়।

সব কথা শুনলে পরিমল। নির্ব্বাক্ হোয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর বললে—ভাবিস নে। সব ঠিক হোয়ে যাবে।

পরিমলের পিতৃবন্ধু শেঠ রনছোড়দাসের মস্ত বড় কারবার। দেশ-জোড়া নানা প্রতিষ্ঠান। হেড-আপিস বোম্বাই সহরের হর্ণবি রোডে। দু'দিন পরে পরিমল তাকে সেখানে নিয়ে গেল। হাজির করলে শেঠজীর সামনে। বললে—এর কথাই বলেছিলাম শেঠজী।

টেবিলের উপর থেকে চশমাটা তুলে নিয়ে শেঠ রনছোড়দাস বললেন—বসুন। বোস পরিমল।

আলাপ পরিচয় হল। যা-কিছু বলার তা আগে থেকে পরিমল বলে রেখেছিল। শেঠজি সেই দিনই সুপ্রিয়কে তাঁর আপিসে ভর্ত্তি ক'রে নিলেন। হিসাব-রক্ষাবিভাগের নিম্নতর সহকারী।

কাজ চেয়েছিল সুপ্রিয়। কাজ পেল। থাকবার কোয়ার্টার

পেল আপিসেরই সংলগ্ন একটি সুদৃশ্য ফ্ল্যাটে। দু'হাত বাড়িয়ে বন্ধুর হাত ধ'রে কৃতজ্ঞতা জানাল।

ছেলেটিকে অনেকক্ষণ ধ'রে লক্ষ্য করেছিলেন শেঠ রনছোড়দাস। কথাবার্ত্তায় আকৃষ্ট হয়েছিলেন। কার্য্যক্ষমতার পরীক্ষা করলেন নিত্য-নূতন কাজের ভার দিয়ে। মাস দুয়েকের মধ্যেই সুপ্রিয় প্রমোশন পেল। মাইনে বাড়ল দ্বিগুণ। বসবার জন্যে আলাদা টেবিল নির্দ্দিষ্ট হল। শেঠজি বুঝলেন, তাঁর নির্ব্বাচন ভুল হয়নি। স্বয়ং ম্যানেজার একদিন এসে মনিবের কাছে নব-নিযুক্ত সহকারীর কাজের প্রশংসা ক'রে গেল।

ভারতবর্ষের নানা স্থানে শেঠজির নানা কারবার। জব্বলপুর আপিসের পুরাতন খাতাপত্র অনেকদিন ধ'রে হিসাব-নিকাশের অপেক্ষায় পড়ে ছিল। সুপ্রিয়র উপর সেই ভার পড়ল।

আনন্দিত হল সুপ্রিয়। কাজের মধ্যে সে ডুবে থাকতে পারবে। ভুলে থাকতে পারবে জগৎ-সংসার। টেবিলের উপর থরে থরে সাজানো খাতাপত্রের মধ্যে সে নিমজ্জিত হল।

ছ'মাসের কাজ একা হাতে ছ'দিনের মধ্যে সম্পাদন করলে। শেঠজি শুনে একটু অবাক হলেন। বললেন—ব্যালান্স-শীট করেছো ? অথবা ট্রায়াল ব্যালান্স ?

—করেছি।

—দাও তো দেখি।

সুপ্রিয় হিসাবের কাগজপত্রগুলি তাঁর হাতে দিলে। শেঠজি বললেন—আচ্ছা। পরে আবার দেখা হবে।

সুপ্রিয় চলে গেল নিজের কাজে। শেঠজি ফোন করলেন অডিটরকে। তাঁর সবচেয়ে সুদক্ষ লোক যেন এখনি একবার আসে।

অডিটর সাহেব নিজে এলেন। হেসে বললেন—ব্যাপার কি শেঠজি! এমন জোর তলব কেন?

—আপনি নিজে এলেন?

অডিটর বললেন—যে রকম কড়া তাগাদা। অন্য কাউকে পাঠাতে ভরসা হল না।

হাতের কাগজগুলি হিসাব-রক্ষকের হাতে দিয়ে শেঠজি বললেন —অনেকদিনের একটা পুরানো হিসাব আজ তৈরী হয়েছে। কিন্তু সেটা ঠিক হয়েছে কিনা তা পরীক্ষা ক'রে বলে দিতে হবে।

কাগজের উপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে অডিটর বললেন—খাতা-পত্রগুলি একবার দেখতে চাই। আর যে কেরাণী এই কাজ করেছে তাকে চাই! দু'চারটে প্রশ্ন আছে।

শেঠজি ডাক দিলেন সুপ্রিয়কে। সুপ্রিয় এসে দাঁড়াতে বললেন —মুখার্জি, ইনিই আমাদের অডিটর মিঃ বার্টলিবয়। তোমার কাজটা ইনি ঠিকমতো বুঝতে পারছেন না। বুঝিয়ে দাও। খাতাপত্র যে-ঘরে আছে সেই ঘরে এঁকে নিয়ে যাও।

সুপ্রিয় বললে—আসুন।

হিসাবরক্ষক সুপ্রিয়র সঙ্গে গেলেন। ফিরে এলেন ঘণ্টা দুই পরে। কাগজগুলি টেবিলের উপর রেখে বললেন—নিখুঁত কাজ। এর চেয়ে ভাল আমিও পারতাম না। হিসাবের ব্যাপারে আশ্চর্য্য মাথা ছোকরার, অদ্ভুত জ্ঞান। কোথায় পেলেন একে?

—কুড়িয়ে পেয়েছি।

—পাকা জহুরী আপনি। হেসে বললেন অডিটর।

* * * * *

ধাপে ধাপে সাফল্যের সোপান অতিক্রম করতে লাগল সুপ্রিয়।

কাজ চাই, আরও কাজ। সকাল থেকে রাত পর্য্যন্ত কাজের মধ্যে মগ্ন হোয়ে রইল সে। এই কাজের বাইরে যে অন্য কোন পৃথিবী আছে তা সে ভুলে থাকতে চায়।

তার কর্ম্মনিষ্ঠা আর দক্ষতার পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ হলেন শেঠ রন্‌ছোড়দাস। আপিসের দশজন প্রধান অফিসারের মধ্যে তার স্থান নির্দ্দিষ্ট ক'রে দিলেন। মুখার্জ্জি সাহেবের এখন স্বতন্ত্র ঘর, আলাদা টেলিফোন, পৃথক আরদালি, বেহারা, মোটর-গাড়ী।

সেদিন বন্ধু পরিমল আপিসে তার সঙ্গে দেখা করতে এলো। ঘরে ঢুকে আসন গ্রহণ ক'রে হাসিমুখে বললে—চাপরাশি ঢুকতে দেয় না হে! বলে, সাহেব এখন ব্যস্ত আছেন!

খাতাপত্র বন্ধ ক'রে সুপ্রিয় হেসে বললে—তাই নাকি! কিন্তু অনেক দিন পরে এলে ব'লে মনে হচ্ছে।

—মনে হচ্ছে তাহলে? হেসে বললে পরিমল—ঢের ঢের লোককে কাজ করতে দেখেছি, কিন্তু তোমার মত কাউকে দেখলাম না। ডুব দিয়ে আর উঠতে চাও না যে! দু'দিন এসে ফিরে গেছি, তা জানো!

ছোট একটা নিঃশ্বাস চেপে নিয়ে সুপ্রিয় বললে—এই কাজ

জুটিয়ে দিয়েছিলে, তাই বেঁচে গেছি বন্ধু! এ ছাড়া আর আমার কি আছে বল!

তাড়াতাড়ি পরিমল বললে—সব আছে। সব আছে। ফেলা যায় নি কিছুই। সব ফিরে পাবে তুমি। আপাতত, শুনলাম নাকি, আমাদের ছেড়ে কিছুদিনের মতো যাচ্ছ বাংলা দেশে?

—কে বললে?

—কেন, শেঠজি স্বয়ং। ধানবাদের কয়লাখনিতে নাকি অনেক দিনের হিসেব-নিকেশ বাকী পড়েছে। তাই তোমাকে পাঠাচ্ছেন সেখানে তিন-চার মাসের জন্যে।

সংক্ষেপে সুপ্রিয় বললে—হ্যাঁ, অর্ডার হয়েছে। যাবার দিন শেঠজি নিজেই স্থির করবেন বলেছেন।

পরিমল বললে—আমি আজ রাত্রে বাবার একটা কাজে পুণা যাচ্ছি। তাই দেখা ক'রে গেলাম। ফিরে এসো আরও সাফল্য, সার্থকতা আর গৌরব সঙ্গে নিয়ে, এই কামনা করি।

উঠে দাঁড়িয়ে সুপ্রিয় বন্ধুর দুই হাত ধরলে। বললে—আমার ভাষা বড় দুর্ব্বল। মনের কথাটা বুঝে নিও তুমি।

তার দু'হাতে ঝাঁকানি দিয়ে হাসিমুখে পরিমল চলে গেল। চলে গেল সুপ্রিয়র মনকে দুলিয়ে দিয়ে। আরও সাফল্য, সার্থকতা আর গৌরব কামনা ক'রে গেল পরিমল, কিন্তু জীবনের শ্রেষ্ঠ অর্থ যে হারিয়ে গেছে, কী হবে সাফল্য আর গৌরব দিয়ে?

চেয়ারে বসল সুপ্রিয়। কাজে মন লাগছে না। টেবিলের এক ধারে বসানো ছিল ফ্রেমে-আঁটা মায়ের ছবিখানি। নির্নিমেষ নেত্রে

কিছুক্ষণ সেই ছবির স্মিত-মুখের পানে চেয়ে রইল। তারপর ধীরে ধীরে দেরাজ টেনে একখানি খাতা বার করলে। পাতা ওলটাতে ওলটাতে এক টুকরো লম্বা ছাপা-কাগজ বার হল। অনেকদিন আগেকার খবরের-কাগজের একটুক্রো সংবাদ। সযত্নে সেটিকে রেখে দিয়েছে সুপ্রিয়। কাগজখানি হাতে নিয়ে সে আর একবার পড়ল :

"বিখ্যাত দানবীর ও সমাজসেবীর আত্মোৎসর্গ।

"গভীর পরিতাপের সহিত জানাইতেছি যে উত্তর কলিকাতার স্বনামখ্যাত ব্যবসায়ী, সমাজসেবী ও দানবীর শ্রীপ্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় এক দৈবদুর্ঘটনায় পরের জীবন রক্ষার্থে মৃত্যুবরণ করিয়াছেন। তিন-চার দিন পূর্ব্বে তিনি কার্য্যব্যপদেশে বর্দ্ধমান অঞ্চলে গিয়াছিলেন সংবাদ পাওয়া যায়। গত পরশু সন্ধ্যায় তিনি কোন কাজে বোধ হয় শক্তিগড় ষ্টেশনে নামিয়াছিলেন। সেখানে ষ্টেশন হইতে অনতিদূরে একটি বস্তি অঞ্চলে সে-সময় অকস্মাৎ আগুন লাগিয়া যায়। শিশু ও স্ত্রীলোকের আর্ত্তনাদে আকৃষ্ট হইয়া প্রিয়নাথ বাবু তাহাদের বাঁচাইবার জন্য সেই আগুনের মধ্যে প্রবেশ করেন ও একটি শিশুকে অগ্নির কবল হইতে বাহির করিয়া আনেন। অতঃপর তিনি পুনরায় অন্য লোকদের বাঁচাইবার জন্য অগ্রসর হন ; কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা ছিল অন্যরূপ, অকস্মাৎ সমগ্র মাঠকোঠাটি তাঁহার মাথার উপর ভাঙিয়া পড়ে ও তিনি তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁহার মাথা, মুখ ও দেহের উপরিভাগ সম্পূর্ণ নিষ্পিষ্ট হইয়া গিয়াছিল। চিনিবার উপায় ছিল না। তাঁহার পরনের জামা ও পকেটের মণিব্যাগ ও কয়েকটি

কাগজ-পত্র হইতে তাঁহার পরিচয় জানা যায়। মানুষের সেবায় প্রিয়নাথ বাবু তাঁহার সমগ্র জীবন নিবেদিত করিয়াছিলেন, শেষ অবধি সেই জীবন পর্য্যন্ত আহুতি দিয়া এক অত্যুজ্জ্বল মহিমাময় আদর্শ লোকসমাজে স্থাপন করিয়া গেলেন। প্রিয়নাথ বাবু বিপত্নীক ছিলেন। তাঁহার একমাত্র পুত্র বর্ত্তমানে বিদেশে। আমরা তাঁহাকে আমাদের আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।"

* * * * *

ধানবাদ।

শেঠ রনছোড়দাসের প্রকাণ্ড কোলিয়ারি। বহু শত লোকজন, আপিস, হাসপাতাল, খনি, ব্যারাক, কোয়ার্টার। সর্বসমেত একটা বিরাট ব্যাপার।

ভবতারণ বাবু এখানকার ম্যানেজার ছিলেন। তিনি কাজ থেকে অবসর নেবার পর সহকারী যোগেশ চট্টোপাধ্যায় সেই পদে উন্নীত হয়েছে। কাজের লোক যোগেশ। বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। কিন্তু দেখে তা মনে হয় না। বছর দশেক এখানে কাজ করছে। তার পূর্ব্বে দালালি কাজে হাত পাকিয়েছিল। কোলিয়ারির কাজেও জ্ঞান অর্জ্জন করেছিল সামান্য নয়। দশ বছরে যোগেশ এখানে যথেষ্ট প্রতিপত্তি বিস্তার করেছে। কুলিদের সর্দ্দার, বস্তিবাসীদের নেতা, শ্রমিকদের দলপতি এবং ঐ ধরণের বহু লোক তার অনুগত। কোলিয়ারির মধ্যে সকলেই তাকে ভয় করে। অত্যন্ত কড়া তার মেজাজ। তার অপ্রসন্ন দৃষ্টি যদি কারুর উপর পড়ে তাহলে

তার আর নিস্তার নেই। নিজের স্বার্থ-সিদ্ধির জন্যে কোন কাজ করতেই পিছপাও নয় যোগেশ। বাইরে অমায়িকতা আর ভদ্রতার অভাব নেই অবশ্য। কোয়ার্টারে তার মা আছেন। আর আছে দুই বোন, সুমিতা আর নমিতা। যোগেশ এখনো বিবাহ করেনি। তবে সম্প্রতি সে বিবাহের জন্যে ব্যস্ত হয়েছে। এবং পাত্রী নির্ব্বাচন ক'রে রেখেছে।

উল্লেখযোগ্য আর যারা এখানে বাসা বেঁধেছে তাদের মধ্যে হিতেন সরকার আর তার ভগ্নী শোভা এখানকার সকলেরই পরিচিত। হিতেন কোলিয়ারিতে যোগেশের সহকারিরূপে কাজ করে। শোভা কলকাতা থেকে ম্যাট্রিক পাশ ক'রে দাদার কাছে এসে আছে।

আর আছেন মহিম হালদার, এখানকার বহুদিনের পুরানো কর্ম্মচারী। বৃদ্ধ হয়েছেন। কিন্তু কাজকর্ম্মে পটুতা এখনো খর্ব্ব হয়নি। স্ত্রী-পুত্র থাকে দেশে। এখানে ছোট একটি ঘর নিয়ে তিনি একা থাকেন। একটি চাকর আছে। সে-ই রান্না-বান্না এবং অন্য সমস্ত কাজ ক'রে দেয়।

আর আছে রামলাল। কুলিদের সর্দ্দার। বৃদ্ধ হয়েছে রামলাল অনেকদিন। লম্বা ঝুলে-পড়া দাড়ি। অবিন্যস্ত পাকা চুলের গোছা মাথায়। বয়সের ভারে ন্যুব্জ দেহ। ছ'মাস হবে রামলাল এখানে এসেছে। কিন্তু এই অল্পদিনেই সে এখানকার সকলের চিত্ত জয় করেছে। কোলিয়ারির সবাই শুধু নয়, এই কয়লাকুঠী সংলগ্ন যে বাঙালী-পল্লী আছে সেখানকার অধিবাসীরাও রামলালকে বিলক্ষণ চেনে ও ভালবাসে। সকলকার তাঁবেদারি করে রামলাল। ছেলে

বুড়ো সকলের কাছে সে সমান প্রিয়। সে যে-কুলি-ব্যারাকে থাকে সেখানকার শ্রমিকরা তো তাকে দেবতার মতো ভক্তি করে। প্রতি মাসে রামলাল যা রোজগার করে তার বেশীর ভাগই তার খরচ হয় সেই সব শ্রমিকদের ছেলেমেয়েদের পিছনে। তাদের খাওয়াতে পরাতে, সেবা-শুশ্রূষা করতে, দুঃস্থ অনাথাদের টাকা জোগাতে রামলাল সর্ব্বদা প্রস্তুত। এসব কাজে তার ভারী আনন্দ।

* * * * *

কোলিয়ারির লাগোয়া বাঙালী-পল্লীর প্রবেশমুখে ভবতারণ বাবুর বাড়ী। বছর দশেক আগে তিনি এই বাড়ীখানি তৈরী করেছিলেন। বাতে অশক্ত হোয়ে চিকিৎসার জন্যে বন্ধু প্রিয়নাথের আগ্রহাতিশয্যে কন্যাকে নিয়ে কলকাতায় গিছলেন এক বিধবা ভগিনীকে বাড়ীতে রেখে। এখানকার সবাই ভবতারণকে বিশেষ শ্রদ্ধা করত। যোগেশ তো তাঁকে রীতিমতো ভক্তি করত। তাই চরম দুঃখের আর অপমানের দিনে যোগেশের কথাই ভবতারণের মনে হয় এবং তাঁকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে তাকেই টেলিগ্রাম করা হয়। 'তার' পেয়েই যোগেশ কলকাতা যায় এবং ভবতারণ বাবুকে ধানবাদ নিয়ে আসে। এখানে এসে মাস দুয়েক মাত্র বেঁচে ছিলেন তিনি। সেই সময়ের মধ্যেই তিনি যোগেশের সঙ্গে প্রমীলার বিবাহ দেবার বাসনায় ব্যস্ত হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর অসুস্থতার জন্যে সে-কাজ অসম্পূর্ণ থেকে গেছে।

কলকাতা থেকে এখানে এসে প্রমীলা যেন অন্য এক জগতের

মানুষে পরিণত হয়েছে। কথা বলে, হাসে, গল্প করে, কিন্তু তবুও যেন সে-মানুষ নয়। যোগেশ প্রত্যহ আসে। তাকে অভ্যর্থনায় ত্রুটি নেই প্রমীলার। মাঝে মাঝে মেয়েদের গানের আসরে গিয়েও বসে। কিন্তু প্রমীলাকে যারা জানে তারা বুঝবে, এ-প্রমীলা তার বাইরের কোন এক ধার-করা সচল মূর্ত্তি, তার আসল রূপটি কোন্ দিগন্তপারের মেঘের অন্তরালে আত্মগোপন করেছে তা তার কথা-বার্ত্তায় আচার-আচরণে টের পাওয়া যায় না, মাঝে মাঝে শুধু মাত্র তার আভাস পাওয়া যায় তার আয়ত দুই চোখের ক্লান্ত করুণ আর অন্যমনা দৃষ্টির গভীরে।

শেষের দিনে ভবতারণ মেয়েকে কাছে ডেকে বলেছিলেন—জীবনের সত্যিকার প্রকাশ কোন্ পথে, কোন্‌টি সত্যি আর কোন্‌টি মিথ্যে তা নিঃসংশয়ে বুঝতে পারলাম না মা! তাই তোর ওপর আমার কোন অনুশাসন নেই, কোন আদেশ, কোন নির্দ্দেশ নেই। জীবনে সত্যিকার পথ কোনটি তা যেন ভগবান তোকে দেখিয়ে দেন।

* * * *

পিতার মৃত্যুর পর পিসিমাকে নিয়ে প্রমীলা ধানবাদে নিজেদের বাড়ীতেই রইল। এখান থেকে চলে যাবার জন্যে সে একরকম মনস্থির করেছিল। শেষ পর্যন্ত পিসিমার খাতিরে তাকে থাকতে হল। ভাইয়ের ভিটা ছেড়ে তিনি নড়তে চাইলেন না।

ভবতারণের লাইফ ইনসিওরেন্স, প্রভিডেণ্ড ফাণ্ড এবং কিছু সঞ্চিত অর্থ যা ছিল, দুটি নারীর ছোট সংসারের পক্ষে তা অকিঞ্চিৎকর নয়। মন্থর উদাসীনতায় প্রমীলার দিন কাটতে লাগলো।

যোগেশ প্রায় প্রত্যহই আসে। এই সংসারের দেখাশোনার ভার সে ভবতারণ-কাকার কাছ থেকে পেয়েছে। পিসিমাও তাকে যথেষ্ট ভালবাসেন। প্রমীলার মনের অন্ত সে পায় না বটে, কিন্তু তার প্রতি কোন বিমুখতার প্রমাণও সে পায়নি। তাই সে প্রমীলার পিতৃশোক প্রশমিত হবার অপেক্ষায় আছে। এমনি করে প্রায় এক বছর কেটেছে।

* * * * *

অপরাহ্ন বেলায় সামনের খোলা মাঠের একটি বেঞ্চিতে প্রমীলা একাকী বসেছিল। কোলিয়ারির পিছন দিকে তার বাড়ীর সামনে এই জনবিরল প্রান্তটি প্রমীলার প্রাত্যহিক বেড়াবার ক্ষেত্র। বহুদূর-বিস্তৃত তৃণভূমির একান্তে ব'সে সে দু'চোখ মেলে দেয় সামনের পৃথিবীর পানে। দৃষ্টির সঙ্গে মন পেরিয়ে যায় কত পথ-প্রান্তর, কত দেশ-দেশান্তর। মহাশূন্যের মতো তার ভিতরটাও যেন শূন্য হোয়ে গেছে। কোন অনুভূতি নেই। না আছে আনন্দ, না আছে বেদনা! অবলম্বনহীন তৃণখণ্ডের মতো সে যেন সেই শূন্যপ্রবাহে ভেসে চলেছে। ছেড়ে দিয়েছে সে নিজেকে সেই ভাগ্য-স্রোতে। তার মনের সব আসক্তি সব শক্তি নিঃশেষ হয়েছে বুঝি।

অদূরে বৃদ্ধ রামলালকে দেখা গেল। কোন কাজে বোধ করি এদিকে এসেছিল। চলেছে, ঘর-মুখো। এই রামলালকে দেখলে প্রমীলার মন মায়ায় ভ'রে যায়। ঘর-ছাড়া এই বুড়ার করুণ ক্লান্ত মুখের পানে তাকালে প্রমীলা মনের মধ্যে কেমন যেন একটা

অনির্দেশ্য বেদনা অনুভব করে। তার সঙ্গে কথা ব'লে ভারী তৃপ্তি পায় প্রমীলা।

আধা-হিন্দি আধা-বাংলা মিশিয়ে রামলাল যখন কথা বলে তখন তন্ময় হোয়ে প্রমীলা শোনে। রামলালের কথার সুর যেন তার মনের তারে গিয়ে আঘাত করে।

—রামলাল! প্রমীলা ডাকল।

ঈষৎ চমকে উঠল রামলাল! থমকে দাঁড়াল। ঘাড় তুলে বললে—হামায় ডাকছেন মাইজী?

প্রমীলা বললে—এখান দিয়ে যাচ্ছ, অথচ আমার সঙ্গে কথা বললে না যে?

দু'হাত কচলে রামলাল জবাব দিলে—মাইজী বহুৎ উদাস হোয়ে কী যেন ভাবছিলেন। বিরক্ত হবেন, তাই কথা বলতে সাহস করিনি।

হাসলে প্রমীলা, বললে—শুধু শুধু উদাস হব কেন? এমনি চুপচাপ বসেছিলাম। এদিকে কোথায় গিছলে তুমি?

—হরিয়ার মায়ের তিন রোজ খুব অসুখ। তার দাওয়াই নিতে এসেছিলাম ডাক্তারবাবুর কাছে।

প্রমীলাদের বাড়ীর কাছে একজন হোমিওপ্যাথ ডাক্তার থাকেন। রামলাল প্রায়ই তাঁর কাছে ওষুধ নিতে আসে।

প্রমীলা বললে—তুমি যে দেশে যাবে বলেছিলে রামলাল? যাবে নাকি? কবে যাবে?

—যাবো বৈ কি, মাইজী, শীগগিরই যাব। দেশে যাবার জন্যে মনটা আমার বড় উদাস হয়েছে।

—দেশে তোমার কে আছে রামলাল ?

রামলাল ঘাড় ঝুঁকিয়ে বললে—সবাই আছে মাইজী। ছেলে আছে, জমি-জমা আছে, গরু-বাছুর আছে•••

—তোমার ছেলের মা ?

—নেই। বহুৎ রোজ। একটু থেমে রামলাল বললে—এইবার শীগগিরই ছেলের সাদি হবে মাইজী! রামলালের কণ্ঠে উৎসাহের সুর ফুটে উঠল—দেশে গিয়েই ছেলের বিয়ে দেব।

কিছুক্ষণ নীরব থেকে প্রমীলা বললে—এখানে আসবার আগে তুমি কোথায় ছিলে রামলাল ?

রামলালের দেহ আরও যেন ঝুঁকে পড়ল, বললে—কত দেশ ঘুরেছি মাইজী, গয়া, পাটনা, পুরী, কটক। আমি এখন যাই, মাইজী!

—আচ্ছা, এসো।

ধীরে ধীরে রামলাল চলে গেল। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে দেখে প্রমীলাও বাড়ী ফিরল।

*　　*　　*　　*　　*

সন্ধ্যার পর এলো যোগেশ। কিছুক্ষণ পিসিমার সঙ্গে গল্প করলে। তারপর পাশের ঘরে গিয়ে বসল। প্রমীলা চা নিয়ে এলো।

—কেমন আছ এ-বেলা ?

যোগেশের প্রশ্নের উত্তরে মুখ তুলে প্রমীলা বললে—ভালই তো আছি! কেন বলুন তো ?

যোগেশ বললে—সকাল-বেলা নাকি খুব মাথা ধরেছিল, ওবেলা তোমার এখান থেকে গিয়ে সুমিতা বলছিল।

মৃদুকণ্ঠে প্রমীলা বললে—সে অতি সামান্য। এতক্ষণ পর্য্যন্ত অসুস্থ থাকার মতো অসুখ নয়।

কিছুক্ষণ কাটল নীরবে।

যোগেশ ইতস্ততঃ করছিল, এইবার বললে—একটা কথা বলবার জন্যে আজ এসেছিলাম।

প্রমীলার বুকের ভিতরটা মোচড় দিয়ে উঠল। ফাঁসীর আসামীর প্রতি মৃত্যুদণ্ডাদেশ দেওয়া হোয়ে গেছে, নিজের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তার আর কোন আশা-ভরসা চিন্তা নেই, তবুও শেষ দিনে যখন তাকে জানানো হয় যে, সময় হয়েছে এবার প্রস্তুত হও, তখন তার বুকটা দুলে ওঠে বৈ কি।

যোগেশ বললে—পিসিমা বলছিলেন যে, তিনি দিন একরকম স্থির ক'রেই রেখেছেন। আসছে মাসেই কাকাবাবুর মৃত্যুর এক বছর পূর্ণ হবে। পিসিমা তো বলছেন আসছে মাসের শেষের দিকেই দিন ফেলবেন।

বহুদিন ধ'রে প্রতিরোধ করেছে প্রমীলা। শক্তি ফুরিয়েছে এবার। তাছাড়া, লাভ কি প্রতিরোধের? প্রয়োজনই বা কি? যা হয় হোক, চোখ বুজে থাকুক প্রমীলা। সত্যিই সে দু'চোখ মুদলো।

যোগেশ বললে—কাকাবাবুর খুবই ইচ্ছা ছিল। পিসিমার তো আগ্রহের শেষ নেই। কিন্তু আসল মানুষটির কাছ থেকে সাড়া পেলাম কই? তাই যতক্ষণ না স্পষ্ট ক'রে তার কথা শুনতে পাচ্ছি ততক্ষণ মনে শান্তি নেই, উৎসাহও নেই।

এটা যোগেশের কূটনীতি। সে জানে, সাংসারিক, বৈষয়িক প্রভৃতি বিবিধ ব্যাপারে প্রমীলাদের সংসারের সঙ্গে নিজেকে জড়িত ক'রে সে এমন ভাবে সকলকার উপর প্রভাব বিস্তার করেছে যাতে কেউ তার প্রস্তাবে আপত্তি করবে না, বরং আনন্দই প্রকাশ করবে। সে আরও জানে, প্রমীলার অন্তর তার জন্যে তেমন উন্মুখ না হলেও তাকে প্রত্যাখ্যান করবে না সে। প্রমীলার মনের খবর সঠিক সে জানে না, পিসিমার মুখে তাদের কলকাতা-বাসের যে-কাহিনী সে শুনেছে তা থেকে নিশ্চয় করে কোন সিদ্ধান্ত করাও সম্ভব নয়। তাই সে প্রমীলার মুখ থেকে সম্মতিসূচক বাণীটি শুনতে চায়।

আজ হঠাৎ সকল গ্রহ-নক্ষত্র আর নিখিল চরাচর বুঝি প্রমীলার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছে। কোন্ দিকে চাইবে প্রমীলা?

—কথা বলছ না যে! উত্তর দেবে না?

ক্ষীণকণ্ঠে প্রমীলা বললে—বাবা আর পিসিমা যা স্থির করেছেন তাতে আপত্তি করিনি তো।

—কিন্তু তোমার ইচ্ছে-অনিচ্ছেও তো প্রকাশ করনি? পিসিমা বলেন, তিনি তোমায় বারে বারে জিগেস করেছেন, কিন্তু তুমি কোন দিন কিছু বলোনি। সাধারণত মৌনকে সম্মতির লক্ষণ ব'লে মেনে নিতে পারা যায় বটে, কিন্তু এ-ক্ষেত্রে আমার মনে খটকা লাগছে। তাই, স্পষ্ট ক'রে বলো তুমি।

মুখ তুললে প্রমীলা। শান্তকণ্ঠে বললে—আমার ইচ্ছে-অনিচ্ছে ব'লে কিছু নেই। আপনার প্রতি আমি কৃতজ্ঞ, আপনাকে শ্রদ্ধা করি, তাতে কোন ভুল নেই। এই পর্য্যন্ত বলতে পারি।

সোচ্ছ্বাসে যোগেশ বললে—ব্যস। ওতেই হবে। অনেক ধন্যবাদ তোমায়। আজ চলি, কেমন? ঝরিয়া থেকে এক সাহেব এসেছে। তার সঙ্গে ডিনারে বসতে হবে।

যোগেশ বিদায় নিলে।

কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে ব'সে রইল প্রমীলা। তারপর হঠাৎ অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে উঠল। এ কী হল? এ কী করলে সে? পিতার মুখ স্মরণ ক'রে সে যে এই চরম দণ্ড মাথা পেতে নিলে,—এ ছাড়া কি আর পথ ছিল না? এই কি সত্য পথ?

নৌকা ভেসেছে অকূলে। তীর দেখা যায় না। ধীরে ধীরে প্রমীলা নিজের ঘরে গিয়ে শয্যার আশ্রয় নিল। এবং ঘুমিয়ে পড়ল।

ঘুমাও প্রমীলা। আজকের রাতের মতো ঘুমাও। কাল নূতন ক'রে জীবন আরম্ভ হবে। আসবে নূতন খবর। নূতনতর পরিস্থিতি। নূতনতর এবং জটিলতর। কঠিনতম পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হবে তোমায়।

* * * * *

সকাল-বেলা কলরব করতে করতে এলো সুমিতা, নমিতা, শোভা। কলকণ্ঠের মহা কোলাহল উঠল।

প্রমীলা বললে—ব্যাপার কি? সকাল-বেলাতেই এত উত্তেজনা? এখনো সারাদিন প'ড়ে আছে। হল কি?

শোভা বললে—অসম্ভব।

—তার মানে?

সুমিতা মাথা-ঝাঁকানি দিলে—মোটেই অসম্ভব নয়।

প্রমীলা তার পানে চেয়ে বললে—তারই বা মানে?

নমিতা বললে—দিদি আর শোভাদির মধ্যে তর্ক বেধেছে, বাজী ধরা হয়েছে। মীমাংসার ভার তোমার ওপর।

এখানে যে-ক'জন মেয়ে আছে তারা সবাই প্রমীলার অনুগত। প্রমীলার গান রেকর্ড হোয়েছে। গায়ক-গায়িকার মুখে মুখে ফেরে সেই গান। মেয়ে-মহলে তার খ্যাতি ও প্রতিপত্তি কম নয়। মেয়েদের নানা অনুষ্ঠানে তার নির্দ্দেশ মতামত ও ব্যবস্থা চূড়ান্ত ব'লে স্বীকার করে সবাই সানন্দে।

নমিতার কথায় প্রমীলা না হেসে থাকতে পারলে না, বললে—ও, এই কথা? তা মীমাংসা তো হয়েই রয়েছে। দু'জনের বাজীই বাজেয়াপ্ত।

কথায় কথায় আসল কথাটা জানা গেল। আগামী-কাল সকালে সুমিতার দাদা যোগেশের হেড-আপিস বোম্বাই থেকে এসে পেঁছবেন একজন সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট। তিনি যে আসছেন এ খবর আগেই এসেছিল। একেবারে কালই যে আসছেন, তা জানা গেছে কাল রাতে-আসা জরুরী টেলিগ্রামে। সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট নাকি খোদ মালিকের ডান হাত, খুব নাকি উগ্র স্বভাব। তবে বাঙালী, এই যা সুরাহা। সুমিতার দাদা যোগেশ সকাল থেকে খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। খোদ মালিকের কোয়ার্টারে থাকবেন সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট। ঝাড়ামোছা আরম্ভ হয়ে গেছে। কাল সকালে ষ্টেশনে যাতে অভ্যর্থনাটা ঘটা ক'রে হয় তারও ব্যবস্থা করেছে যোগেশ। শুধু আপিসের সবাই ষ্টেশনে যাবে না,—সুমিতা, নমিতা, শোভা, এরাও যাবে। সঙ্গে থাকবে ফুলের মালা, শাঁখ, খই চন্দন ইত্যাদি।

প্রমীলা বললে—তা তো হল। কিন্তু সম্ভব-অসম্ভবের মীমাংসার হদিস তো পেলাম না এখনো ?

সুমিতা বললে—ক্রমে পাবে। শোন মন দিয়ে। দাদা বলেছেন, সুপারিন্‌টেন্‌ডেন্টকে অভ্যর্থনায় আর আপ্যায়নে একেবারে অভিভূত ক'রে দিতে হবে। কাল তিনি দুপুরে আমাদের বাড়ী নেমন্তন্ন খাবেন। রাত্রে হিতেনদা'র বাড়ী ডিনার। পরশু দিন সন্ধ্যায় তাঁর জন্যে ইনষ্টিটিউটে এক সম্বর্দ্ধনা-সভার আয়োজন করছেন দাদা। নাচ-গান দিয়ে জমকালো বিচিত্রানুষ্ঠান হবে। সেই সব নাচ-গান তৈরী করা আর অনুষ্ঠান পরিচালনা করার ভার পড়েছে তোমার ওপর। শোভা বলছে, একদিনের মধ্যে কোন ভাল প্রোগ্রাম তৈরী করা অসম্ভব। আমি বলছি মোটেই অসম্ভব নয়। এখন তুমি বল।

—এই কথা! প্রমীলা বললে—তা এ আর এমন শক্ত কথা কি! সম্ভবও বটে, অসম্ভবও বটে।

—এ আবার কেমন ধারা মীমাংসা হল ?

—অর্থাৎ যদি তোমরা তৈরী হোয়ে নিতে পারো তাহলে সম্ভব, অন্যথায় অসম্ভব! প্রমীলা হাসতে লাগলো।

সুমিতার উৎসাহ প্রবল। সে বললে—না প্রমীলাদি, হাসলে চলবে না। সময় নেই মোটেই। কি হবে না হবে, ঠিক ক'রে দাও।

আলোচনার পর স্থির হল, নূতন কোন নাচ বা গান তৈরী করা সম্ভব নয়। যা তৈরী আছে তাই দিয়েই অনুষ্ঠানলিপি রচনা করতে হবে। যথা, সুমিতা আর নমিতার দ্বৈত সঙ্গীত, নমিতার আরতি

নৃত্য, "ক্ষম হে ক্ষম" গানের সঙ্গে শোভার ভাব-নৃত্য এবং সমবেত সঙ্গীত—"আমাদের যাত্রা হল শুরু"।

সুমিতা নমিতা শোভা তিনজনেই চেঁচামেচি করতে লাগল, প্রমীলার একটি গান থাকা চাই। প্রমীলার রাজী হওয়া ছাড়া গত্যন্তর রইল না।

সুমিতা বললে—তাহলে যাই দাদাকে বলি গে। হ্যাঁ, ভাল কথা, তুমি কাল সকালে ষ্টেশনে যাচ্ছ তো?

—দুর! আমি যাব কেন? বললে প্রমীলা।

—বা রে! আমরা যাচ্ছি কেন?

—তোমাদের দাদারা নিয়ে যাচ্ছে বলে। উত্তর দিল প্রমীলা।

শোভা হঠাৎ বলে উঠল—তাহলে তুমি যাবে যোগেশদা' তোমায় নিয়ে যাবেন বলে। খবর পেয়ে গেছি সুমিতাদের বাড়ী!

সুমিতা শোভাকে চোখের ইসারা করলে। শোভা আরও কি বলতে যাচ্ছিল, চুপ ক'রে গেল।

প্রমীলা বললে—তাহলে যেমন গোলমাল করতে করতে এসেছিলি সব, তেমনি গোলমাল করতে করতে চলে যা এখন। আমার কাজ আছে।

* * * * *

টেলিগ্রাম পেয়ে যোগেশ ব্যস্ত হয়েছে। ব্যস্ত এবং উদ্বিগ্ন। কোলিয়ারি পরিদর্শন করতে যিনি আসছেন তাঁকে সে চেনে না। শুনেছে হিসাব-নিকাশের কাজে ধুরন্ধর, আর বিচার করে চুলচেরা। বাঙালী বটে, তবে তাতে ভরসার কথা কিছু নেই। সঙ্গে আসছে

একজন ভাটিয়া সহকারী। যাকে বলে একেবারে সরজমিনে তদন্ত।

এতদিন ধ'রে যে রাম-রাজত্ব পরিচালনা করেছে যোগেশ, সে-রাজত্ব কি টলমল ক'রে উঠবে এবার? মনে মনে কঠিন হল যোগেশ। পরিদর্শন করুক যে যত পারে, কিন্তু তার আধিপত্যে হস্তক্ষেপ করা সইবে না সে।

কিন্তু হয়ত অমূলক তার ভয়! দু'-চার দিনের জন্যে যে আসছে, আদর-আপ্যায়নে আর মধুর ব্যবহারে তাকে বশীভূত করতে পারবে না সে? নিশ্চয় পারবে। তবুও সাবধানের মার নেই। খাতা-পত্রগুলো ঠিক ক'রে ফেলতে হবে দু'-এক দিনের মধ্যেই।

মহিম হালদারকে আপিস-কামরায় ডাকা হল। বৃদ্ধ এসে দাঁড়ালেন হুকুমের প্রতীক্ষায়। যোগেশ বললে—কাল সকালে বোম্বাই মেলে সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট আসছে, জেনেছেন বোধ হয়?

মহিম বললেন—আজ্ঞে হ্যাঁ, হিতেন বাবু এসেই সবাইকে জানিয়ে দিয়েছেন।

—কাল সকালে সবাই ষ্টেশনে যাবেন।

—আজ্ঞে হ্যাঁ, যাব বৈ কি।

যোগেশ বললে—হয়ত তিনি 'আপিসের খাতাপত্র দেখবেন। সেগুলো সব আপটুডেট্ করা আছে তো?

—তা আছে।

—হিসাব-পত্র?

মহিম ঘাড় নেড়ে বললেন—অন্য সমস্তই ঠিক ক'রে নিতে পারবো

বা বুঝিয়ে দিতে পারবো, কিন্তু আপনি নিজে যে টাকাগুলোর লেনদেন করেছেন তার কোন হিসেব দেননি। সে-সম্বন্ধে···

যেন কিছুই মনে নেই এমনি ভাবে যোগেশ বললে—দিইনি নাকি? কত টাকা?

—তা প্রায় চল্লিশ হাজার টাকা। তিন-চার দফায়।

—চার বছরে চল্লিশ হাজার! এমন কিছু বেশী নয়। বললে যোগেশ—হিসেবটা আপনি ঠিক ক'রে নেবেন।

—আজ্ঞে, আমি কেমন করে···

তীক্ষ্ণ হাসি হাসলে যোগেশ। তীক্ষ্ণ ও অর্থপুর্ণ। বললে—হালদার মশাই হাসালেন। যোগ দিয়ে আর বিয়োগ ক'রে, কেটে আর জুড়ে চুল পাকালেন, আর এই সামান্য কাজটায় ভড়কে যাচ্ছেন। চার বছরে চল্লিশ রকম খরচ দেখিয়ে টাকাটাকে খাইয়ে দেবেন, এই আর কি! আশা করি, আরও স্পষ্ট ক'রে বলতে হবে না। কিছু উপরি রোজগার ক'রে নিন না। ধরুন, হাজার খানেক! হিসেবটা শেষ ক'রে আমায় দেখাবেন আর টাকাটা এসে রাত্রিবেলা আমার বাড়ী থেকে নিয়ে যাবেন।

দু'চোখ তুলে তাকিয়ে রইলেন হালদার মশায়। কিছুক্ষণ পরে বললেন—তা কি সম্ভব হবে?

—দেখুন হালদার মশাই। একটা কথা ব'লে দি। থম্‌থমে যোগেশের কণ্ঠস্বর—জলে বাস করতে হলে কুমীরের সঙ্গে ভাব রাখতেই হবে। অন্যথায় বিপদ। আশা করি, কথাটা বুঝলেন। অতএব যান, হিসেব আর খাতাপত্র ঠিক ক'রে ফেলুন গে।

ঘণ্টা বাজালো যোগেশ। বেহারা ঘরে ঢুকতে বললে—সরকার-বাবু।

হতভম্বের মতো মহিমবাবু প্রস্থান করলেন। হিতেন ঘরে ঢুকলো। যোগেশ বললে—লোকজন লেগেছে কাজে ?

হিতেন ঘাড় নাড়ল।

—কাল সকালে সবাইকে ষ্টেশনে উপস্থিত থাকতে বলবে।

—বলে দিয়েছি।

যোগেশ এক মিনিট কি যেন ভাবলে, তারপর বললে—সুপারিন্‌টেনডেন্ট ভদ্রলোকটিকে চিনি না! তবে শুনেছি খুব রাশভারী আর কড়া মেজাজের লোক। তাঁকে আমাদের আদর অভ্যর্থনা ভাল ভাবেই করতে হবে। কি বল ?

হিতেন ঘাড় নেড়ে বললে—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—কিন্তু তাই ব'লে ভয় পেলে চলবে না। তিনি যদি এসেই আমাদের ওপর যথেচ্ছা হুকুম চালাতে থাকেন, তা আমাদের মনঃপুত হবে না।

যোগেশের কথার তাৎপর্য্য হিতেন হৃদয়ঙ্গম করতে পারলে কি না, বোঝা গেল না। সে চুপ করে রইল।

পুনরায় কিয়ৎকাল নীরব থেকে যোগেশ বললে—সাবধানে কাজকর্ম্ম করবে। আর আমাদের প্রোগ্রামটা শুনে নাও। কাল দুপুরে তিনি আমার বাড়ীতে নেমন্তন্ন খাবেন। বিকালে তুমি তাঁকে চায়ের নেমন্তন্ন করবে। পরশু তাঁকে আমরা সভা ক'রে অভ্যর্থনা জানাবো। নাচ-গানের একটা অনুষ্ঠান তৈরী করবার জন্যে সুমিতাকে

বলেছি প্রমীলার সঙ্গে পরামর্শ ক'রে ব্যবস্থা করতে। আমি নেমন্তন্ন-পত্রের একটা খসড়া ক'রে রেখেছি। খানকয়েক টাইপ করিয়ে নাও। বাইরের লোকের মধ্যে পুলিশ সাহেব, মুনসেফবাবু আর জিতেন উকিলকে বলবে। বাদবাকী আমরা নিজেরা। এই নাও।

যোগেশ পেনসিলে-লেখা একটুকরো কাগজ হিতেনের হাতে দিয়ে বললে—খানদশেক টাইপ করিয়ে রাখ। কাল তিনি এলে, তারপর বিলি করা হবে।

অন্যান্য দু-চার কথার পর হিতেন চলে গেল। তারপর এলো জগুয়া। কুলিদের একজন সর্দ্দার। অনেকদিন এখানে আছে। যোগেশের হাতের লোক। শ্রমিকদের মধ্যে যারা গুণ্ডা-প্রকৃতির, বদমায়েস, তাদের বশীভূত ক'রে রেখেছে যোগেশ এই জগুয়ার সহায়তায়। টাকা পেলে জগুয়া পারে না এমন কাজ নেই।

সেলাম ক'রে বললে—হুজুর ডেকেছেন?

—হ্যাঁ, জগুয়া। যোগেশ সোজা হয়ে ব'সে বললে—কাল বোম্বাই থেকে একজন বড়-সাহেব আসছেন, সঙ্গে আছেন আর একজন ছোট-সাহেব। তাঁরা কোলিয়ারির কাজ দেখবেন, তারপর বোধ হয় নতুন নতুন আইন জারী করবেন।

জগুয়া ঘাড় নাড়ল—তাতে আমাদের ভাল হবে তো হুজুর?

—তা তো বলতে পারি না জগুয়া। তবে তোমাদের যখন আমি এতদিন দেখে এসেছি তখন এখনো দেখবো, তোমাদের ওপর কোন অন্যায় আমি মেনে নেব না।

—হুজুর মা-বাপ। আপনার ভরসাতেই আমি আর অন্য সবাই এখানে আছি।

—কাল তাঁরা আসছেন। যোগেশ বলতে লাগল—তোমরা সবাই ফরসা কাপড়-চোপড় প'রে গেটের সামনে হাজির থাকবে। তাঁদের খুব ঘটা করে আমরা খাতির দেব। তারপর দেখা যাবে। এই নাও।

একখানা দশ টাকার নোট এগিয়ে দিলে যোগেশ। এমনি বখশিস জগুয়া প্রায়ই পেয়ে থাকে। নোটখানা কোমরে গুঁজে সেলাম ক'রে জগুয়া বললে—হুজুরের গোলাম আমি। যা হুকুম করবেন তার খেলাপ হবে না।

—আচ্ছা, যাও।

জগুয়া চলে গেল। সর্ব্বশেষে এলো রামলাল।

—রামলাল! কোথায় ছিলে? অনেকক্ষণ ডেকেছি তোমায়! যোগেশের কণ্ঠস্বর ঈষৎ রুক্ষ শোনালো।

মাথা চুলকিয়ে মহা-অপরাধীর মতো রামলাল বললে—হরিয়ার মায়ের খুব অসুখ হুজুর! তার জন্যে দাওয়াই আনতে গিছলুম।

যোগেশ বললে—কাল বোম্বাই মেলে দু'জন ভারী সাহেব আসছে আমাদের কারখানা দেখতে। ষ্টেশনে হাজির থাকবে। আর যিনি বড়-সাহেব, তিনি থাকবেন শেঠজীর বাংলায়। সেখানকার ঘর-দালান আজকের মধ্যে সাফ হওয়া চাই। হিতেন বাবুকে ব'লে দিয়েছি। তুমিও গিয়ে দেখ। আর বড়-সাহেব যে-ক'দিন এখানে থাকবেন, সে-ক'দিন তুমি থাকবে তাঁর আর্দালি। তোমার অন্য কাজ করতে হবে না।

—বহুৎ আচ্ছা, হুজুর।

—যাও। তোমার ব্যারাকে যে-সব কুলি আর বেহারা থাকে তাদের বলে দাও গে, কাল সকালে তারা যেন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হোয়ে গেটের সামনে হাজির থাকে।

এই ব'লে যোগেশ চেয়ার ছেড়ে উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। রামলাল মন্থর গমনে চলল তার পিছনে পিছনে।

* * * * *

সন্ধ্যার পর যোগেশ এলো প্রমীলার কাছে। বললে—সুমিতারা এসেছিল সকালে ?

ঘাড় নাড়লে প্রমীলা।

ভৃত্য বুধন চা দিয়ে গেল। পাত্রটা নিঃশেষ ক'রে যোগেশ বললে—সারাদিন খুব ব্যস্ত থাকতে হয়েছিল। এবং মহাপ্রভু দু'জন যে-ক'দিন থাকবেন সে-ক'দিন ব্যস্ত থাকতে হবেও। রোজ হয়ত দেখা হবে না। পরশুর প্রোগ্রামটা ঠিক ক'রে দিয়েছো ?

মৃদুকণ্ঠে প্রমীলা জবাব দিলে—ওরাই একরকম ঠিক ক'রে নিয়েছে।

—তুমি একটা গান গাইবে তো ?

প্রমীলা জবাব দিলে—ওরাই গাইবে। আমার গানের দরকার হবে না। ইচ্ছে নেই।

ঈষৎ ঝুঁকে ঈষৎ জোর দিয়ে যোগেশ বললে—না, তোমার একটা গান থাকা চাই। আমার বিশেষ অনুরোধ। গাইবে তো ?

—আচ্ছা।

খুসী হল যোগেশ। বললে—সুপারিন্‌টেনডেণ্ট-সাহেব লোকটি বাঙালী। আশা করি, তোমার গান শুনে তারিফ করবার মতো রসবোধ তাঁর আছে।

প্রমীলা একটুখানি হাসল। নরম গলায় বললে—আপনাদের কাছে আমার গান যতখানি ভাল লাগে, অন্য সকলের কাছেও তা তেমনি ভাল লাগবে, এমন তো কোন কথা নেই। ভাল নাও লাগতে পারে।

—বলো কি! তোমার গান শুনে ভাল লাগবে না, এমন মানুষ আছে নাকি?

—থাকতে কি পারে না?

—সম্ভব নয়। মৃদু হেসে যোগেশ বললে—আর একটা কথা। সুমিতাদের বিশেষ ইচ্ছে, কাল ষ্টেশনে তুমি ওদের সঙ্গে যাও। আমারও খুব ইচ্ছে।

প্রমীলা মুখটা ঈষৎ ঘুরিয়ে নিলে। শান্তকণ্ঠে বললে—মাপ করবেন। ষ্টেশনে যাব না। আমায় বাদ দিতে হবে।

তাড়াতাড়ি যোগেশ বললে—বেশ। তোমায় যেতে হবে না। আমিও সেই কথাই ওদের ব'লে দিয়েছি।

কথায় কথায় আরও কিছুক্ষণ কাটল। তারপর যোগেশ বিদায় নিলে। প্রমীলা বাইরের বারান্দায় এসে দাঁড়াল। শুক্লপক্ষের চাঁদ দেখা দিয়েছে আকাশে। বাতাসে মৃদু সুগন্ধ ভেসে আসছে। আকাশের কোণে একটা বড় তারা অনবরত দপদপ করছে। কিসের ইঙ্গিত যেন সে জানাতে চায় প্রমীলাকে।

প্রান্তরের ওপারে ঝক্‌ঝক্‌ শব্দ। ট্রেন আসছে। বেশ লাগে ট্রেনের শব্দ শুনতে। কত লোক আসছে। কত লোক তাদের ঈপ্সিত স্থানে চলেছে। তাদের হৃদয়ে কত না আশা, প্রিয়-মিলনের কত না প্রত্যাশা!

অনেকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল প্রমীলা। ট্রেন আসছে।

*   *   *   *

ভোর না হোতেই সাজ সাজ রব পড়ে গেছে! কোলিয়ারির আপিসের তোরণ-দ্বারে আমের পল্লব লাগানো হয়েছে। বসানো হয়েছে পূর্ণঘট। আলপনা এঁকেছে সুমিতা। তার উৎসাহই সব চেয়ে বেশী। সকলের আগে সেজে-গুজে সবাইকে তাড়া দিয়ে সে ষ্টেশনে গিয়ে উপস্থিত হয়েছে।

যাদের ষ্টেশনে আসবার কথা একে একে সবাই হাজির হল। যোগেশ সকলকে নিজের নিজের জায়গায় দাঁড় করিয়ে দিলে। মেয়েরা দাঁড়ালো সামনে।

যথা সময়ে ঘণ্টা বাজল। ট্রেন প্ল্যাটফর্মে ঢুকছে। সবাই সজাগ সোজা হোয়ে দাঁড়াল। মেয়েরা শঙ্খধ্বনি করল।

ট্রেন থামল। ফাষ্ট´ক্লাসের ছোট কামরার দরজার সামনে দাঁড়িয়ে সুপ্রিয়। সস্মিত মুখ, প্রসন্ন দৃষ্টি।

চিনতে ভুল হল না কারুর যে এই লোকটির জন্যেই তারা অপেক্ষা করছে। যোগেশ এগিয়ে গেল; দু'হাত তুলে বললে—মিঃ মুখার্জি? বোম্বাই থেকে?

—তাতে আর ভুল নেই। বলে সুপ্রিয় নামল প্ল্যাটফর্মে।

আবার বাজল শাঁখ। খই ছড়িয়ে পড়ল আশে-পাশে। সুমিতার

হাতের থালা থেকে মালা তুলে নিয়ে যোগেশ সুপ্রিয়র গলায় পরিয়ে দিলে। হাসিমুখে দু'হাত জোড় ক'রে দাঁড়িয়ে থাকা ছাড়া সুপ্রিয়র গত্যন্তর রইল না। সে কিছু অভিভূত বোধ করছে বৈ কি!

অতঃপর পরিচয়ের পালা। যোগেশ প্রথমে নিজের পরিচয় দিলে। তারপর একে একে সুমিতা, নমিতা শোভা এগিয়ে এল। তারপর আপিসের অন্য সকলে।

সুপ্রিয় বললে—আপনাদের দেখে আজ জীবনে সত্যিই একটি বিশেষ আনন্দ অনুভব করছি। মনে হচ্ছে যেন অনেক দিন পরে নিজের হারানো আত্মীয়দের কাছে ফিরে এলাম।

যোগেশ প্রশ্ন করলে—মিঃ পারেখ? তিনি কোন্ কামরায়?

সুপ্রিয়র সঙ্গে তার সহকারীরূপে পারেখ নামে অপর এক ব্যক্তি আসবেন, জানা ছিল। মাথা নেড়ে সুপ্রিয় বললে—সে আমার সঙ্গে আসতে পারেনি। কাজে আটকে আছে। সম্ভবত কাল প্লেনে আসবে কলকাতায়। সেখানকার কাজ সেরে এখানে এসে পোঁছোবে। আজ সন্ধ্যায় ফোন ক'রে জেনে নেব কখন সে আসবে।

যোগেশ হাঁক দিলে—রামলাল।

সবার পিছনে দাঁড়িয়েছিল কুলির সর্দ্দার রামলাল। বিস্ফারিত চোখে সে দেখছিল সুপ্রিয়কে। ডাক শুনে চমকে উঠল। ভয়ে যেন শীর্ণ হল। ঘাড় ঝুঁকে পড়ল।

ধীরে ধীরে এগিয়ে এল রামলাল। আভূমি-প্রণত সেলাম করলে। যোগেশ বললে—রামলাল! জলদি, সামান উতারো।

রামলাল ধীরে ধীরে কামরার মধ্যে ঢুকলো। যোগেশ বললে

—চলুন, মিঃ মুখার্জি। আমরা এগুই। মাল-পত্তর সর্দ্দার কুলির জিম্মায় রইল। ঠিকমতো পেঁ ৗছোবে।

সুপ্রিয় বললে—ব্রীফ-কেসটা একটু দরকার। তারপর গলা বাড়িয়ে রামলালকে উদ্দেশ করে বললে—বিছানার ওপর যে লম্বা চামড়ার ব্যাগটা রয়েছে সেটা দাও তো, কুলি।

উৎকর্ণ হোয়ে সে আদেশ শুনলে রামলাল। যোগেশ বললে—হিতেন, তুমি মেয়েদের নিয়ে যাও। আমি যাব এঁর সঙ্গে।

ব্রীফ-কেসটা আনতে রামলালের এত বিলম্ব হচ্ছে কেন? হিতেন তাড়া দিয়ে উঠল।

মাথা নীচু ক'রে রামলাল বেরিয়ে এলো। এগিয়ে দিলে জিনিষটা সুপ্রিয়র দিকে। সুপ্রিয় হাত বাড়ালো। লক্ষ্য করলে, কুলিটার হাতখানা কাঁপছে। হয়ত একটু বিস্মিত হল। তারপর ব্যাগটা টেনে নিলে।

যোগেশ বললে—চলুন।

ষ্টেশনের সম্বর্দ্ধনা-পর্ব্ব শেষ হল।

* * * * *

বিকাল-বেলা প্রমীলার বাড়ীর সামনে রামলালের সঙ্গে দেখা হল প্রমীলার।

—রামলাল যে! তোমাদের নতুন সাহেব এলেন তাহলে? বললে প্রমীলা।

মহা খুসী রামলাল। বললে—হাঁ, মাইজি! এসেছেন। আমিই

তাঁর খিদ্‌মদ্‌গারীতে লেগেছি। তাঁকে দেখা-শোনা করবার সব ভার আমার ওপর পড়েছে। আমি তো সারাদিন তাঁর বাংলোতে ছিলাম।

—তাই নাকি! সাহেবটি কেমন?

—খুব ভাল, মা, চমৎকার! আর, সাহেব কোথায়? একদম বাঙালী আছেন! সবাইকার সঙ্গে ভাব হয়েছে। আপনি সকালে ষ্টেশনে গেলেন না তো মাইজি?

প্রমীলা হাসলো—আমি কেন যাব? আমি কি তোমাদের কোম্পানীর লোক যে, অভ্যর্থনা জানাতে হবে আমায়?

এক মুহূর্ত্ত রামলাল কী ভাবল; তারপর বললে—ঠিক! ঠিক বলেছেন মাইজি! আপনি কেন যাবেন? আমি যাই মাইজি, সাহেব এইবার বোধ হয় বেড়াতে বেরুবেন। বলছিলেন, বড় গরম লাগছে, ফাঁকা জায়গায় একটু বেড়াবেন। ঐ যে মাইজি, ওই যে, সাহেব বোধ হয় এই দিকেই আসছেন।

প্রমীলা বললে—আচ্ছা, রামলাল, তুমি তোমার সাহেবের কাছে যাও। আমিও বাড়ী ফিরি।

এই ব'লে প্রমীলা সত্য সত্যই বাড়ীর দিকে চলে গেল।

* * * * *

সুপ্রিয়র সম্বর্দ্ধনা-সভা।

অনুষ্ঠান-লিপি তৈরী হয়েছে এই ভাবে :—

১। স্বস্তিবাচন। ২। যোগেশ কর্ত্তৃক প্রধান অতিথি সুপ্রিয়কে

সম্বৰ্দ্ধনা জ্ঞাপন। ৩। প্রধান অতিথির ভাষণ। ৪। নৃত্য-গীতের বিচিত্রানুষ্ঠান।

সুসজ্জিত মঞ্চের এক ধারে প্রধান অতিথির আসন পাতা হয়েছে। তার দু'ধারে আর দু'চারখানি চেয়ার। সুপ্রিয়র এক পাশে বসেছেন মুনসেফ-বাবু। অন্য পাশে যোগেশ।

নির্দ্ধারিত সময়ে অনুষ্ঠান আরম্ভ হল। বৃদ্ধ মহিম হালদার কম্পিত কণ্ঠে "স্বস্তিবাচন" পাঠ করলেন। তারপর যোগেশ উঠে দাঁড়িয়ে উচ্চ কণ্ঠে তার সম্বর্দ্ধনার বক্তৃতায় বললে, সুপ্রিয়কে তাদের মধ্যে পেয়ে তারা সবাই কৃতার্থ হয়েছে। সুপ্রিয় যে তাদের উপরওয়ালা-রূপে এখানে এসেছে তাতে এই প্রতিষ্ঠানের সবাই গৌরবান্বিত এবং আশান্বিত বোধ করছে। তাদের আশা ও বিশ্বাস, সুপ্রিয়র কাছে তারা সুবিচার পাবে, তাদের সকল দুঃখ এবং অভাব দূর হবে।

মঞ্চের ভিতরে উইংসের পাশে মেয়েরা সেজে-গুজে দাঁড়িয়ে আছে। বক্তৃতার পালা শেষ হলেই তাদের পালা শুরু হবে।

স্বস্তিবাচন শেষ হবার পর প্রমীলা উপস্থিত হল সেখানে। তার আসতে দেরী হয়ে গেছে। মেয়েরা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন বোধ করছিল সে জন্যে। ইন্‌স্‌টিটিউটে পোঁছে সভাস্থলে না গিয়ে সে পিছনকার দরজা দিয়ে একেবারে সাজঘরে উপস্থিত হল। তাকে দেখে মেয়েরা কোলাহল ক'রে উঠল।

—কী অন্যায়। কী অন্যায়। এত দেরী? যাক। বাঁচা গেল। আমরা তো ভয়েই সারা। ইত্যাদি।

প্রমীলা বললে—অবেলায় ঘুমিয়ে প'ড়ে তোদের কাছে এই গাল-মন্দ খেতে হল। তোরা তো দেখছি সবাই প্রস্তুত। সুমিতা কই? এই যে! ইস! এ যে একেবারে সাক্ষাৎ 'বঁধু, কোন্ মায়া লাগল চোখে।'

নববধূর মতো সেজেছে সুমিতা। মাথায় পরেছে ফুলের মুকুট। কপালে এঁকেছে চন্দনের লেখা। সঁীথিতে দুলিয়েছে লাল-পাথর-বসানো স্বর্ণাভরণ। চোখে টেনেছে ঘন কাজলের দীর্ঘায়িত রেখা। 'বঁধু, কোন্ মায়া লাগল চোখে,' এই গানের সঙ্গে আছে তার একক নৃত্য।

হেসে বললে প্রমীলা—"তেপান্তরের প্রান্ত পারায়ে কে তুমি এলে আমার হৃদয়-সরসী কূলে! তোমারে চিনি না, তবু দেখি দুই নয়ন মেলে, কাঁপন লাগিছে মর্ম্মমূলে।" আমার মাথাই তো ঘুরে যাচ্ছে তোকে দেখে। অতএব অব্যর্থ হবে তোর শর-সন্ধান, তাতে আর সন্দেহ নেই।

মেয়েরা হেসে উঠল। কপট কোপ ভরে সুমিতা বললে—যাও। কী যে যা-তা বল!

শোভা হাঁপাতে হাঁপাতে এসে বললে—যোগেশদা বক্তৃতা দিচ্ছেন। চল না প্রমীলাদি, উইংসের পাশে দাঁড়িয়ে শুনি গে। তুমি তো চীফ গেষ্ট মিঃ মুখার্জ্জিকে এখনো দেখনি, না?

—না, কৈ আর দেখলাম! চল্। বলে প্রমীলা সাজঘর থেকে উইংসের পাশে গিয়ে দাঁড়াল।

শোভা বললে—ঐ দেখ! কী চমৎকার দেখতে, না? মালা পরে বসেছেন, যেন বর বসেছে বাসরে।

প্রমীলা তাকিয়ে দেখলে! তাই তো! এ কী হল! হঠাৎ তার চোখে কি ধাঁধা লাগল? মাথাটা ঘুরে উঠল যে! দৃষ্টির কী ভ্রম! এক মানুষকে অন্য মানুষ ব'লে ভুল করা!

কিন্তু ভুল তো নয়। গায়ে সেই ঢিলেঢালা গরদের পাঞ্জাবী; পায়ে সেই সাদা চামড়ার লপেটা; চুলের সেই চির-পরিচিত পরিপাটী! এ মূর্ত্তি কি ভোলবার? প্রমীলা হাঁ করে তাকিয়ে রইল। তার বাহ্যজ্ঞান বোধ হয় লুপ্ত হয়েছে।

শোভা কি বলবার জন্যে প্রমীলার মুখের পানে তাকালো। কিন্তু প্রমীলার একান্ত অন্যমনস্ক দৃষ্টি দেখে সে কিছু বললে না। মুখ টিপে হেসে পাশের সঙ্গিনীকে কি যেন ইঙ্গিত করলে।

সম্বিৎ ফিরে পেলো প্রমীলা। কিন্তু তার সমস্ত শরীরের এ কী অবস্থা হল! হঠাৎ সর্বদেহ অনড় পাষাণ হয়ে গেল না কি!

যোগেশের বক্তৃতার পর সুপ্রিয় উঠে দাঁড়াল। চারি দিকে ঘন করতালি ধ্বনিত হল। মৃদু স্পষ্ট নম্র এবং উদাত্ত স্বরে সুপ্রিয় বললে—আজ আপনাদের কাছে যে সম্বর্ধনা পেলাম, বিনয়-মধুর বাক্যে মৌখিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন ক'রে তার মূল্য দিতে চাইনা। আপনাদের সম্বর্ধনার পিছনে যে অন্তরের যোগ রয়েছে তার মায়া বিস্তারিত হয়েছে আমার মনে। তাকে সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ ক'রে ধন্য হলাম। আমি আশা ও কামনা করছি, আপনারা আমাকে নিজেদের মধ্যে গ্রহণ করবেন, বন্ধুর মতো, আত্মীয়ের মতো। আপনাদের মধ্যে আমি খুঁজে পাবো আমার আপন-জন, আমার পরম হিতাকাঙ্ক্ষী সুহৃদ্। আপনাদের কাছে থেকে, আপনাদের কাজে লেগে আমার জীবন সার্থক হবে।

ভাবগম্ভীর ভাষণের সহজ আন্তরিকতার সুর সভাস্থলের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত হয়েছে। সকলে আর্দ্র স্তব্ধ-চিত্তে সুপ্রিয়র কথা শুনছে।

শুনছে প্রমীলা বিহ্বলের মতো। শুনছে যোগেশ, সুমিতা, নমিতা, শোভা। শুনছেন মুনসেফ-বাবু ঘাড় উঁচু করে।

আর শুনছে একজন। সে রামলাল। সভায় প্রবেশের সাহস বা অধিকার তার নেই। প্রেক্ষাগৃহের এক অন্ধকার কোণে আবর্জ্জনা-স্তূপের পাশে দাঁড়িয়ে নিষ্পলক নেত্রে সে চেয়ে আছে বক্তার দিকে। তার দুই চোখের ঘোলাটে দৃষ্টিতে সে কী অপূর্ব্ব করুণ অভিব্যক্তি!

সুপ্রিয় বলতে লাগল—আপনারা আমার কাছে সুবিচার পাবার আশা করেছেন। আশা করেছেন, আপনাদের দুঃখ, আপনাদের অভাব-অভিযোগ আমি মোচন করতে পারবো। আমার একমাত্র প্রার্থনা, আপনাদের আশা ও বিশ্বাসের মর্য্যাদা আমি যেন রাখতে পারি। মানুষকে সেবা করার মহৎ ব্রতের যে মহিমান্বিত প্রকাশ দেখেছি আমার পূজনীয় পূর্ব্ব-পুরুষের জীবনে, তা আমার জীবনকে প্রেরণা দিয়েছে, গঠন করেছে, চরম সার্থকতার গৌরবোজ্জ্বল পথের সন্ধান দিয়েছে। মানুষকে সেবা ক'রে তার বিপদ আর দুঃখকে দূর করবার কাজে নিজের জীবনকে আহুতি দেবার প্রেরণা আমার রক্তের মধ্যে সঞ্চারিত আছে। এর বেশী বলার সাধ্য আমার নেই। সেই প্রেরণাই আমায় পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে। পরিশেষে সকলকে আমার যথাযোগ্য শ্রদ্ধা সম্মান শুভেচ্ছা জানাই।

ঘন ঘন করতালি-ধ্বনিতে সভাস্থল মুখরিত হল। মুখর হল শ্রোতৃবৃন্দের প্রশংসার বাণী। গুঞ্জনধ্বনি উঠল চারি দিকে।

তারপর কিছুক্ষণের মধ্যেই নৃত্যগীতের বিচিত্রানুষ্ঠান আরম্ভ হল। হিতেন সাজঘরের ভিতরে শিল্পীদের পরিচালনার কাজ করছিল, প্রমীলা তার কাছে গিয়ে বললে—প্রোগ্রাম থেকে আমার নামটা কেটে দিন, হিতেন বাবু!

—সে কি! আপনি গান করবেন না?

—না!

—কেন?

—বড্ড শরীর খারাপ লাগছে। অসম্ভব মাথা ধরেছে। নামটা ঘোষণা করবেন না। প্লীজ!

—আচ্ছা। বলে হিতেন অন্য দিকে চলে গেল।

এলো যোগেশ। বললে—হঠাৎ শরীর খারাপ হল কেন? অ্যাসপিরিন আনিয়ে দেব?

ক্লিষ্ট কণ্ঠে প্রমীলা বললে—বাড়ী গিয়ে খেয়ে নেব। বড্ড খারাপ লাগছে। গাইতে পারবো না।

—আচ্ছা, আচ্ছা, তবে থাক। তুমি বরং এই চেয়ারটায় বোসো। বলে যোগেশ একটা চেয়ার এনে দিলে। প্রমীলা বসল। সত্যিই সে যেন আর দাঁড়াতে পারছিল না।

দু'-চার কথার পর যোগেশ চলে গেল অন্য দিকে। মেয়েরা একে একে এসে দুঃখ ও উদ্বেগ জানিয়ে গেল। প্রমীলা নীরবে বসে রইল। তার আশে-পাশের মানুষগুলির কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন

হোয়ে সে যেন বহু দূরে দিক্-বিহীন প্রান্তরের শেষ সীমায় একাকিনী ব'সে আছে।

অনুষ্ঠান শেষ হোয়ে গেল। সে খেয়াল তার নেই। হঠাৎ যোগেশের কণ্ঠস্বরে তার চমক ভাঙল। যোগেশ বলছে—হিতেন, মিঃ মুখার্জ্জি আসছেন শিল্পীদের অভিনন্দন জানাতে। তুমি ওদের সারবন্দী ক'রে দাঁড় করিয়ে দাও। এসো প্রমীলা!

বিস্ফারিত চোখে প্রমীলা বললে—আমি কোথায় যাব?

উত্তরে যোগেশ বললে—যাঁর জন্যে আজকের অনুষ্ঠান তাঁর সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দিই। ওই যে এসেছেন।

অদূরে সুপ্রিয় এসে দাঁড়িয়েছে। মেয়েদের নাচ-গান খুব ভাল হয়েছে। একে একে সকলকে সে অভিনন্দন জানাচ্ছে।

যন্ত্রচালিতের মতো যোগেশের সঙ্গে প্রমীলা এগিয়ে গেল। যোগেশ বললে—মিঃ মুখার্জি! আর-একজনের সঙ্গে আপনার পরিচয় করিয়ে দিই। ইনি মিস প্রমীলা চক্রবর্ত্তী। মেয়েদের নাচ-গানের যে সাফল্য তার মূলে আছেন ইনি। ইনিই এদের সব শিখিয়েছেন।

ঘুরে দাঁড়াল সুপ্রিয়। মুহূর্ত্ত কাল। কিন্তু কী সুদীর্ঘ সেই মুহূর্ত্ত! নমস্কার শেষ ক'রে প্রমীলা অন্য দিকে তাকিয়ে আছে। কি বলতে যাচ্ছিল সুপ্রিয়। থামলো। দু'হাত একত্রিত করে বললে—নমস্কার। ভারী আনন্দ হল আজ।

যোগেশ বললে—মিস্ চক্রবর্ত্তী চমৎকার গাইতে পারেন। গ্রামোফোন রেকর্ড আছে। আজ গাইবার কথা ছিল। শরীর খারাপ বলে গাইলেন না।

প্রমীলার দিকে তাকালো যোগেশ। তারপর অর্থপূর্ণ হাসি হেসে বললে—যাই হোক, আশা করছি, শীগগিরই এঁর গান আপনাকে শোনাতে পারবো।

সুপ্রিয় বললে—সে তো আমার সৌভাগ্যের কথা।

যোগেশের কথা শুনে কেঁপে উঠল প্রমীলা। সর্ব্ব শরীর হিম হ'য়ে গেল যেন। আবরণ রইল না আর। নিজেকে লুকোবার আর জায়গা নেই। সেই কবে কোন্ ত্রেতাযুগে কন্যার সম্ভ্রম এবং মর্য্যাদা বাঁচাবার জন্যে, জননী, তুমি উঠেছিলে বিদীর্ণ হোয়ে, কোলে টেনে নিয়েছিলে তোমার সন্তানকে, সকল মানুষের দৃষ্টির আড়ালে, আয়ত্তের অন্তরালে,—আজ প্রমীলার জন্যে আর-একবার পারো না দেখা দিতে তেমনি ক'রে, তার এই চরম লজ্জা আর অপার অসহায়তার মূহূর্ত্তে ?

সুপ্রিয়র কণ্ঠস্বর শোনা গেল—সকলকে আর-একবার নমস্কার এবং ধন্যবাদ জানাই। তাহলে এবার বোধ হয় যাবার পালা। হিতেন বাবু, একটু এগিয়ে দিন। পথের সঙ্গে পরিচয় এখনো তেমন পাকা হয়নি।

—চলুন। এই দিকে।

চলে গেল সুপ্রিয়। যোগেশ বললে প্রমীলাকে—চল, তোমায় পৌঁছে দিয়ে যাই।

বাড়ীর দরজার কাছে এসে যোগেশ বললে—সত্যিই তোমায় খুব অসুস্থ দেখাচ্ছে। খানিকক্ষণ বিশ্রাম করগে। আমি অ্যাসপিরিন পাঠিয়ে দিচ্ছি।

মৃদু কণ্ঠে প্রমীলা বললে—আছে আমার কাছে। খেয়ে নেব। একটু বিশ্রাম করলেই মাথাধরাটা কমে যাবে।

—আচ্ছা, চললাম। কাল দেখা হবে।

—আসুন। বলে প্রমীলা ভিতরে চলে গেল। নিজের ঘরে গিয়ে কাপড়-চোপড় বদলাল। তারপর সোরাই থেকে এক গ্লাস জল নিয়ে বেশ ক'রে ছিটিয়ে দিলে মুখে চোখে কানে ঘাড়ের পিছন দিকে। শীতল জলের স্পর্শে আরাম বোধ করলে। সজীবতা ফিরে পেলে। কী অভাবনীয় কাণ্ড! ব্যাপারটা এখনো যেন ভাল করে ধারণার মধ্যে ধরতে পারছে না সে।

পাশের ঘর থেকে পিসিমা ডাক দিলেন—প্রমীলা, এলি?

—হ্যাঁ, পিসিমা এলাম। ব'লে প্রমীলা তাঁর ঘরে ঢুকলো। হঠাৎ মনের মধ্যে খুসীর ভাব জেগে উঠল নাকি?

শুয়েছিলেন পিসিমা। উঠে বসে বললেন—সভা নাচ-গান শেষ হল?

—হল।

—কেমন হল?

—উত্তম হল।

পিসিমা ক্ষণেক নীরব থেকে বললেন—যোগেশ বলছিল, তাদের নতুন মনিবের সঙ্গে তোদের নাকি আলাপ-পরিচয় করিয়ে দেবে। আলাপ হল নাকি?

—আমার সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হয়নি পিসিমা! শুয়ে পড় তুমি। আমি তোমার খাবার যোগাড় করি গে।

—এতো তাড়াতাড়ি খেতে পারবো না মা, একটু দেরী ক'রে আনিস্।

—আচ্ছা তাই আনবো। ব'লে প্রমীলা ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল। অন্ধকার আকাশের গায়ে তেমনি তারার আলপনা। শুকতারাটা তেমনি দপ-দপ ক'রে কথা বলছে। প্রমীলা তাকিয়ে রইল আকাশের পানে। থেকে থেকে একটি প্রিয় কবিতা মনে পড়ছে তার—

"খোলো, খোলো হে আকাশ, স্তব্ধ তব নীল যবনিকা,
খুঁজে নিতে দাও সেই আনন্দের হারানো কণিকা।
কবে সে যে এসেছিল, আমার হৃদয়ে যুগান্তরে,
গোধূলি-বেলার পান্থ, জনশূন্য এ মোর প্রান্তরে,
ল'য়ে তার ভীরু দীপশিখা।
দিগন্তের কোন্ পারে চলে গেল আমার ক্ষণিকা!
ভেবেছিনু গেছি ভুলে, ভেবেছিনু পদচিহ্নগুলি
পদে পদে মুছে নিলো সর্ব্বনাশী অবিশ্বাসী ধুলি।
আজ দেখি সেদিনের সেই ক্ষীণ পদধ্বনি তার
আমার গানের ছন্দ গোপনে করেছে অধিকার।
দেখি তার অদৃশ্য অঙ্গুলি,
স্বপ্নে অশ্রু-সরোবরে ক্ষণে ক্ষণে দেয় ঢেউ তুলি।"

এ-কবিতা কি প্রমীলার জীবনের আজকের এই দিনটির জন্যেই লেখা হয়েছিল?

* * * * *

পরদিন।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়েছে। প্রমীলা ব'সে আছে নিজের ঘরে, সুমুখে

সেলাইএর কল নিয়ে। পিসিমার শরীর ভাল নেই। তিনি ঘুমিয়ে পড়েছেন। ভৃত্য বুধন সদর-দরজার কাছে বাঁধানো বেদীর উপর ব'সে তারস্বরে রামায়ণ-গান করছে।

সকাল থেকে সারাদিন প্রমীলা বাড়ীর বার হয়নি। বিকালেও না। সারাদিন যেন তার গা ছম্-ছম্ করেছে। ঐ বুঝি কে এলো! ঐ বুঝি কে ডাকলে!—এক অভিনব বিচিত্র অনুভূতি।

সারাটা দিনের বেশী সময় সে কাটিয়েছে পিসিমার ঘরে। আজে-বাজে গল্প করেছে। পিসিমার কাছে নানা উপদেশ শুনেছে। শুনেছে যোগেশের সম্বন্ধে তাঁর প্রশংসা-মুখর মতামত। পুরোহিত ডাকিয়ে তিনি যে কাল-পরশুর মধ্যেই সব ব্যবস্থা পাকা ক'রে ফেলবেন, তাও সে জেনেছে।

সে যা হয় হোক। আজকের মতো আত্ম-গোপন করুক প্রমীলা। কাল রাত থেকে তার স্নায়ুতন্ত্রীর ভিতর দিয়ে এক অসহনীয় প্রতিক্রিয়ার স্রোত প্রবাহিত হচ্ছে।

টুকি-টাকি অনেকগুলি সেলাই বাকী ছিল। সময় কাটাবার উত্তম পথ। সেলাই-এর জিনিস-পত্র নিয়ে প্রমীলা গুছিয়ে বসল।

কিন্তু সুবিধা হচ্ছে কৈ? ক্ষণে ক্ষণে অন্যমনস্ক হচ্ছে। হাতের টিপ স'রে যাচ্ছে। সেলাই বসছে না ঠিকমতো। সেলাইএ বসছে না মন। কানের কাছে কে যেন অনবরত গুঞ্জরণ করছে :

"হে আত্মবিস্মৃত, যদি দ্রুত তুমি না যেতে চমকি
বারেক ফিরায়ে মুখ পথমাঝে দাঁড়াতে থমকি,
তাহলে পড়িত ধরা রোমাঞ্চিত নিঃশব্দ নিশায়

দু'জনের জীবনের ছিল যা চরম অভিপ্রায়।

তাহলে পরম লগ্নে সখি,

সে ক্ষণকালের দীপে চিরকাল উঠিত আলোকি।"

ভৃত্য বুধন হাঁপাতে হাঁপাতে ঘরে এসে ঢুকলো। মুখ না তুলেই প্রমীলা বললে—কি রে ?

—দিদিমণি, কুঠির বড়বাবু এসেছেন!

কল থেমে গেল। আড়ষ্ট বোধ করলে প্রমীলা। প্রতিদিনের এই আসা-যাওয়া। প্রতিদিন সেই একই কথার পুনরাবৃত্তি, কেমন আছ? মাথা ধরেনি তো? ইত্যাদি। আজ কিন্তু কিছুতেই উঠতে ইচ্ছে করছে না। অপ্রিয়-সঙ্গ-সহনের চেয়ে নিঃসঙ্গতা সহ্য করা সহজ, বাঁকা কথার চেয়ে বাঁকা সেলাই ভাল।

কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে প্রমীলা বললে—চায়ের জল চড়িয়ে দিগে যা।

যোগেশ চায়ের বড় ভক্ত, দেরী হলে নিজেই বলবে, বাবা বুধুয়া, একটু চা কর।

সেলাই গুটিয়ে প্রমীলা উঠল। বুধন বললে—জলখাবার আনবো না ?

তার প্রশ্ন শুনে বিস্মিত হল প্রমীলা। যোগেশ প্রায় প্রত্যহই আসে। চা খায়। কিন্তু জলখাবারের আয়োজন তো হয় না কোন দিন! তার মুখের পানে তাকিয়ে বুধন বললে—কুঠির বড়বাবু এয়েছেন কি না, নতুন লোক, তাই যদি জলখাবার…

—কে এসেছে ? ত্রস্ত ও চাপা কণ্ঠস্বরে প্রমীলা শুধালো।

বুধন বললে—সেই যে গো, যিনি তিন দিন আগে বেলাত থেকে এখানে এলেন, কাল যাঁর জন্যে থ্যাটার হল, তাঁর গলায় মালা দেওয়া হল—কুঠির বাবুদের নতুন মনিব…

সর্ব্বনাশ! লুকিয়ে থাকার সকল চেষ্টা যে এমন আচম্বিতে ব্যর্থ হবে তা কে জানতো?

আবার মুখোমুখী! প্রমীলাকে রক্ষা কর ভগবান! সে যেন নিজেকে হারিয়ে না ফেলে। হেরে না যায়।

—আচ্ছা, তুই যা। আমি যাচ্ছি।

বুধন চলে গেল। ধীরে ধীরে বিছানার উপর বসল প্রমীলা।

সামনের আয়নায় তার ছায়া পড়েছে। সেদিকে তাকিয়ে রইল। বিশীর্ণ আর বিষন্ন দেখাচ্ছে তাকে। কিন্তু তা তো চলবে না। সহজ স্বাভাবিক প্রফুল্ল হোতে হবে।

টাইমপিসটা টিক্ টিক্ শব্দ করে চলেছে। কান পেতে প্রমীলা সেই শব্দ শুনল। মুহূর্ত্তের পর মুহূর্ত্ত কেটে যাচ্ছে। নিজের কথার নিজেই যেন উত্তর দিচ্ছে প্রমীলা ঃ

"হে পান্থ, সে পথে তব ধূলি আজ করি যে সন্ধান,
বঞ্চিত মুহূর্ত্তখানি পড়ে আছে, সেই তব দান।
অপুর্ণের লেখাগুলি তুলে দেখি, বুঝিতে না পারি;
চিহ্ন কোন রেখে যাবে, মনে তাই ছিল কি তোমারি?"

এই কবিতাটার হাত থেকে কিছুতেই যেন নিস্তার পাচ্ছে না প্রমীলা। কি কুক্ষণেই কাল সন্ধ্যায় তার মনে 'ক্ষণিকার' উদয় হয়েছিল।

বুধন এসে ডাক দিলে—দিদিমণি!

চমকে উঠল প্রমীলা।

বুধন বললে—অনেক দেরী হচ্ছে যে দিদিমণি! চা ক'রে দিয়েছি। তিনি খাননি। বসে আছেন চুপ ক'রে।

নিঃশব্দে প্রমীলা ঘর ছেড়ে বেরুলো।

তাকে দেখে উঠে দাঁড়াল সুপ্রিয়। তারপর মুখস্থ পড়া বলার মতো এক নিশ্বাসে বলে গেল—কাল তোমায় দেখে অবাক হোয়ে গিয়েছিলাম। কী যে বলব ভেবে পাইনি। হঠাৎ যে এ-ভাবে দেখা হবে তা কল্পনা করিনি। আজ সকালে যোগেশবাবুর কাছে কাকাবাবুর কথা পাড়তেই তাঁর মুখে সমস্ত শুনলাম।

সুপ্রিয় থামল। প্রমীলা নিরুত্তর।

সুপ্রিয় বলতে লাগল—যাই হোক, মস্ত সান্ত্বনার কথা এই যে, তোমায় কোন অসুবিধেয় পড়তে হয়নি। যোগেশবাবুর মতো হিতৈষী পাওয়া ভাগ্যের কথা। তিনি বললেন যে কাকাবাবুর কাছ থেকে তিনি তোমাদের দেখা-শোনার ভার পেয়েছেন, তিনিই এখন তোমাদের অভিভাবক। শুনে আনন্দ হল। ভাবলাম, এত দূরে এসে যখন হঠাৎ দেখা হল তখন তোমার সঙ্গে দেখা করে না যাওয়াটা অকর্ত্তব্য হবে। তাই এলাম। রামলাল তোমার বাড়ীটা দেখিয়ে দিলে।

কথা ফুরালো এক পক্ষের। অপর পক্ষ তথাপি নীরব। সুপ্রিয় বললে—তুমি বোস। দাঁড়িয়ে রইলে কেন?

ঘরের মধ্যে সামান্য আসবাব। একখানি চতুষ্কোণ টেবিলের এক ধারে একখানা চেয়ার। তাতে বসেছিল সুপ্রিয়। অপর দিকে একটি

ছোট বেঞ্চি। তারই হাতল ধ'রে দাঁড়িয়েছিল প্রমীলা। সুপ্রিয়র কথায় সে সেই বেঞ্চির উপর বসল। বাধ্য ছাত্রী যেন শিক্ষকের আদেশ পালন করল।

সুপ্রিয় বললে—বাবার কথা কিছু শুনেছো নাকি ?

এতক্ষণে প্রমীলার কণ্ঠ দিয়ে স্বর নির্গত হল। মৃদু কণ্ঠে বললে —খবরের কাগজে পড়েছি।

অন্যমনস্কভাবে সুপ্রিয় বললে—বোম্বাই-এ ব'সে আমিও খবরের কাগজ মারফৎ জানতে পারলাম। এমন যে ঘটবে তা কল্পনা করিনি।

টেবিলের উপর চায়ের পেয়ালা তেমনি পড়েছিল। চা খায়নি সুপ্রিয়। প্রমীলার দৃষ্টি লক্ষ্য ক'রে সে বললে—সন্ধ্যার পর আমি চা খাই না, তা তুমি ভুলে গিয়েছো। চা-টা নষ্ট হল।

প্রমীলা কি যেন বলবার উদ্যোগ করলে। কিন্তু বলা হল না।

"এ কী লজ্জা, এ কী মিছে ভাণ
কথা ছিল বলিবার, সময় যে হল অবসান।"

আবার সেই 'ক্ষণিকা'! মনের মধ্যে এলোমেলো চিন্তা, এলোমেলো কথা। বুকের মধ্যে কুণ্ডলী পাকাচ্ছে। সুপ্রিয়র কথা কানে আসছে— যোগেশ বাবু বলছিলেন, কিছুদিন থেকে তোমার শরীর নাকি ভাল নেই। দেখছিও তাই, তোমাকে রীতিমতো কাহিল বোধ হচ্ছে।

আর চুপ ক'রে থাকা যায় না। প্রমীলা বললে—না। আমি বেশ ভালই আছি।

—খুব ভাল কথা। শুনে আনন্দ হল। আচ্ছা, আজ তা'হলে উঠি। কয়েক দিন যখন থাকছি, তখন আবার হয়ত দেখা হবে।

অন্যমনস্কের মত প্রমীলা প্রশ্ন করলে—কত দিন থাকতে হবে?

উত্তরে সুপ্রিয় বললে—এখানকার সব কাজ দেখতে আর বিলি-ব্যবস্থা করতে মাস তিনেক লাগবে মনে হয়।

মনে মনে প্রমাদ গণলে প্রমীলা। তিন মাস! সে যে অনেক দিন।

উঠে দাঁড়াল সুপ্রিয়। বললে—চলি তাহলে। একটা কথা জেনে আনন্দ হল যে গানের চর্চ্চা বজায় রেখেছো। কাল তো তোমার গান গাইবার কথা ছিল। শোনা হল না। তবে যোগেশবাবু বলেছেন, একদিন তোমার গান শোনাবার ব্যবস্থা করবেন।

সুপ্রিয়র মুখে হাসি দেখা দিল। সে-হাসি দেখলো প্রমীলা। কী লজ্জা, কী লজ্জা! শুধু লজ্জা নয়, রাগও। রাগে আর লজ্জায় প্রমীলা বিহ্বল হ'য়ে গেল। কিন্তু কিসেরই বা লজ্জা আর কেনই বা রাগ? হঠাৎ কণ্ঠস্বরে জোর এনে বললে—আমি আর গান করি না!

আবার হাসল সুপ্রিয়। বললে—সেটা উচিত নয়। ভগবানের কাছে যে দান পেয়েছো তা থেকে নিজেকে এবং অপরকে বঞ্চিত করা আনন্দের নয়।

উভয়ে দাঁড়িয়ে। সুপ্রিয় প্রস্থানোদ্যত। তার দৃষ্টি দরজার বাইরে। সেই ফাঁকে তার পানে এক চমক চাইলে প্রমীলা। বাঁ হাতের মণিবন্ধের উপর দৃষ্টি পড়ল। একটা সাধারণ নিকেলের রিষ্টওয়াচ পরেছে সুপ্রিয়। হঠাৎ প্রশ্ন ক'রে বসল প্রমীলা—হাতে একটা অন্য ঘড়ি দেখছি। সে-ঘড়িটা কি হল?

প্রশ্ন শুনে ঘুরে দাঁড়াল সুপ্রিয়। ঈষৎ হেসে বললে—সে-ঘড়ি আর হাতে মানায় না। তুলে রেখে দিয়েছি। মনে করছি, বিক্রি

করে দেব। চড়া দাম পাওয়া যাবে। আচ্ছা, আজ চলি, কেমন ?

কিছুই বললে না প্রমীলা। সুপ্রিয় চলে গেল। ঘর আর বারান্দা, মাঠ আর আকাশ, দুলতে লাগল প্রমীলার চোখের সামনে অনেকক্ষণ।

প্রমীলা যে-ঘড়ির কথা উল্লেখ ক'রে ফেলেছিল সেই ঘড়ির এক অবিস্মরণীয় মধুর ইতিহাস আছে। পথ চলতে চলতে সেই কথাই কি স্মরণ করতে লাগল সুপ্রিয় ? সেই কথাই কি স্মরণ করতে লাগল প্রমীলা তার নির্জ্জন গহকোণে ব'সে ?……

একদিন সকাল-বেলা। সুপ্রিয় নিজের ঘরে ব'সে কয়েকখানা হিসাব-নিকাশের মোটা কেতাব নিয়ে উল্টে-পাল্টে দেখছিল এমন সময় এক ঝলক বসন্ত-বাতাসের মতো চারিদিকে মৃদু সৌরভ ছড়িয়ে ঘরে ঢুকলো প্রমীলা।

বই বন্ধ করতে হল। চেয়ার ঘুরিয়ে নিলে সুপ্রিয়। টেবিলের কাছে এসে প্রমীলা বললে—ওই মোটা মোটা ধ্যাবড়া বইগুলো আমার চক্ষুশূল। যখনই আসব তখনই দেখবো, পাহাড়ের মতো ওইগুলো দাঁড়িয়ে আছে সামনে। আজ ওরা দূর হোক।

এই বলে সত্যিই সে দু'হাতে বইগুলো ঠেলে সরিয়ে দিলে। সুপ্রিয় হাসিমুখে তাকালো তার পানে। স্নান সেরে এসেছে প্রমীলা। কেতকী-কুসুমে সুরভিত কেশপাশ পিঠের উপর এলায়িত। কপালে কুঙ্কুমের টিপ। পরণে সুশুভ্র বেশবাস।

সুপ্রিয় বললে ঃ

"আজি নির্মল বায় শান্ত উষায় নির্জন গৃহকোণে
স্নান অবসানে শুভ্রবসনা আসিয়াছ কি কারণে ?
তব বাম বাহু বেড়ি শঙ্খবলয় তরুণ ইন্দুলেখা।
এ কী মঙ্গলময়ী মূরতি বিকাশি প্রভাতে দিতেছো দেখা।"

ত্রস্ত হোয়ে তাড়াতাড়ি বললে প্রমীলা—ওই পর্য্যন্তই থাক। দোহাই তোমার! পরের লাইনগুলো যেন বোলো না! মারা পড়ব তাহলে!

—আচ্ছা, তবে থাক। বললে সুপ্রিয়—এখন তোমার আবির্ভাবের কারণ ব্যক্ত কর।

প্রমীলা বললে—আজ কোন কাজ নয়।

—কেন ?

—দেওয়াল-পঞ্জীতে লক্ষ্য কর আজকের তারিখ।

—লক্ষ্য করছি।

—মাথায় ঢুকলো কিছু ?

—ঢুক্‌লো এতক্ষণে। আজ আমার জন্মদিন।

মাথা দুলিয়ে প্রমীলা বললে—তাই বলছি, আজ কোন কাজ নয়।

মুখ টিপে হেসে সুপ্রিয় বললে—কিন্তু ও-কথাটা বলব আমি। তোমার মুখে মানায় না। ওটা পুরুষের উক্তি। তোমার মুখে ব্যাকরণ আর মিল বজায় থাকবে না।

চোখে চোখ রেখে প্রমীলা বললে কৌতুকভরে—থাকতেও পারে। মিল বজায় রেখে বলতে পারি।

—অসম্ভব। বল তো শুনি।

প্রমীলা গ্রীবাভঙ্গী করলে—পারি না নাকি? শোন:

আজ কোন কাজ নয়, সব ফেলে দিও
ছন্দোবদ্ধগ্রন্থগীত, এসো তুমি প্রিয়…

—ওয়ান্ডারফুল!

—এইও!

চকিতে দূরে সরে গেল প্রমীলা। দরজার বাইরে দৃষ্টি পড়ল তার। সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল—ভৈরব, ঠাকুরকে বলো তো বাবা, এখনি চায়ের জল বসিয়ে দিক। দু' কাপের মতো।

ভৈরব কি কাজে এদিকে আসছিল। হুকুম পেয়ে ফিরে চলে গেল। ঘুরে দাঁড়িয়ে কোপ-কটাক্ষ হেনে প্রমীলা বললে—মজাবে তুমি একদিন। চাকর-বাকরদের সামনে একটা কেলেঙ্কারি ঘটাবে কোন্ সময়। যাক্, শোন। এখনি আমার সঙ্গে বেরুতে হবে! তৈরী হোয়ে নাও।

সবিস্ময়ে সুপ্রিয় বললে—এখন, এই সকালে? কোথায় যেতে হবে?

—দোকানে। আজ তোমার জন্যে একটি উপহার কিনবো।

—তাই নাকি? কি উপকার দেবে?

—তা বলব না এখন। তবে ভাল জিনিষই দেব। অকাজের নয়, কাজের। কাজে যখন মগ্ন থাকবে, ঘুরবে বাইরে, তখন সেটি থাকবে তোমার সঙ্গে, তার স্পর্শের মধ্যে দিয়ে তুমি অনুভব করবে আমায়, তা দেখে জানতে পারবে, আমার কাছে ফেরবার সময় হল কি না।

সুপ্রিয়র হাতঘড়ি ছিল না। অনেকবার সে বলেছে সুপ্রিয়কে ঘড়ি কিনতে, কিন্তু সে গা করেনি। তাই প্রমীলা স্থির করেছে, এই সুযোগে তাকে একটি সুন্দর রিষ্টওয়াচ উপহার দেবে। নিজের সামান্য কিছু সঞ্চিত অর্থ আছে, তারই সদ্ব্যবহার করবে সে। এই কথা যতই মনে হচ্ছে ততই আনন্দিত বোধ করছে প্রমীলা।

—বেশ তৈরী হচ্ছি। দাও ওই পিরানাটা।

—দাড়ি কামিয়ে নাও। আমি চা নিয়ে আসি।

দুই চোখ বড় ক'রে সুপ্রিয় বললে—আবার দাড়ি কামাতেও হবে? তার প্রয়োজন নেই। দাড়ি গজায়নি। আজ না কামালেও চলবে।

—না, চলবে না। দাড়ি গজিয়েছে। একগাল দাড়ি নিয়ে আমার সঙ্গে যাবে, সে হবে না।

হতাশ ভাবে সুপ্রিয় বললে—কি আশ্চর্য্য! আমার দাড়ি গজিয়েছে কি না তা আমি জানি না ?

—না, জান না।

—নিশ্চয় জানি। গজায়নি দাড়ি। বিশ্বাস না হয়, অনুভব করে দেখ।

—ধ্যেৎ। ব'লে প্রমীলা চা আনতে পালাল।

ডালহাউসি স্কোয়ারে এক বিলাতী ঘড়ির দোকানের সামনে ট্যাক্সি এসে থামলো। সাহেব দোকানদার তখন সবেমাত্র দোকান খুলে শো-কেসে মালপত্র সাজিয়ে রাখছিল। দুই প্রিয়দর্শন খরিদ্দার দেখে হাসিমুখে বললে—সুপ্রভাত। আজকের দিনটি আমি ভালই আরম্ভ করলাম ব'লে মনে হচ্ছে।

প্রমীলা সোজাসুজি পরিষ্কার ইংরেজীতে বললে—এঁর জন্যে একটা হাতঘড়ি চাই। ভাল জিনিষই নেব। সোনার ঘড়ির সঙ্গে সোনার ব্যাণ্ড। পাওয়া যাবে?

ঘাড় হেলিয়ে দোকানদার বললে—নিশ্চয় যাবে। আশা করি, আপনি যে-রকম জিনিষ চাইছেন, ঠিক সেই রকম জিনিষ আপনাকে দিতে পারবো। এক মিনিট।

এই ব'লে দোকানদার পিছনের আলমারি খুলে ছোট একটি বাক্স বার ক'রে নিলে। তার ভিতর থেকে বেরুলো একটি সুন্দর সৌখিন চতুষ্কোণ সোনার ঘড়ি, তার ডালার মধ্যে সোনার হরফ, সঙ্গে চমৎকার সূক্ষ্ম কাজকরা সোনার ব্যাণ্ড।

ঘড়ি দেখে খুসী হল প্রমীলা। হাতে তুলে নিয়ে বললে—বেশ জিনিষ। আমার পছন্দ।

সুপ্রিয় মনে মনে ব্যস্ত হচ্ছিল। জিনিষ দেখেই বুঝেছিল, দাম হবে অনেক। বললে—এটা বড্ড বেশী সৌখিন আর দামী ব'লে মনে হচ্ছে। এর চেয়ে সাধারণ...

ঘাড় বেঁকিয়ে প্রমীলা বললে—এটাই আমি নেব।

দোকানদারের পানে চেয়ে সুপ্রিয় বললে—কত দাম?

দাম শুনে সুপ্রিয় আরও ব্যস্ত হল। বললে—বড্ড চড়া দাম। দেখ, এর চেয়ে কম দামের...

শান্তকণ্ঠে প্রমীলা বললে—ভাল জিনিষ পেতে গেলে চড়া দামই দিতে হয়।

তারপর দোকানীর দিকে ফিরে বললে—এটা নিলাম।

—ধন্যবাদ। ক্যাশ-মেমো কেটে দিই ?

—কাটুন। ব'লে প্রমীলা নিজের ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে এক গোছা নোট বার ক'রে দাম দিলে। বললে—প্যাক করবার দরকার নেই। বাক্সটা দিন আমার হাতে।

ঘড়ির কেসটি রাখলে ব্যাগের মধ্যে। তারপর ঘড়িটি নিয়ে সুপ্রিয়কে বললে—দেখি তোমার বাঁ হাত।

প্রমীলার কাণ্ড দেখে সুপ্রিয় অবাক হয়ে গেছে। বাঁ হাত বাড়িয়ে দিলে। মণিবন্ধে ঘড়ি পরিয়ে দিলে প্রমীলা।

সুপ্রিয় বললে—এত সৌখিন আর দামী জিনিষ হাতে মানায় না।

প্রমীলা জবাব দিলে—তা বটে। সবার হাতে মানায় না।

ঘড়ি পরানোর দৃশ্য দেখে খুসীতে দোকানদারের দুই চোখ ভরে উঠল। উভয়ের পানে তাকিয়ে বললে—বাক্‌দান, বিবাহ, জন্মদিন অথবা বিবাহ-বার্ষিকী, এই চার উপলক্ষ্যকে স্মরণীয় করতে এর চেয়ে ভাল উপহার আর কিছু হ'তে পারতো না। আপনাদের ক্ষেত্রে কোন্ উপলক্ষ্যটি অনুমান করে নেব ?

উত্তর দিতে গিয়ে অনির্ব্বচনীয় হয়ে উঠল প্রমীলা, মুখে-চোখে কৌতুকাভা বিচ্ছুরিত করে বললে—চারটে উপলক্ষ্যকেই একসঙ্গে অনুমান ক'রে নিতে পারেন।

উত্তরের বাক-বৈদগ্ধ্যে শুধু সুপ্রিয় নয়, ইংরেজ বেচনদারও হাঁ হোয়ে গেল।

ফিরে দাঁড়িয়ে প্রমীলা বললে—চলো যাই।

দু'জনে ট্যাক্সিতে উঠল। প্রমীলা বললে—বেশ লাগছে জায়গাটা। ট্যাক্সিকে দীঘির চার ধার ঘুরে যেতে বল।

—সে আবার কি! তোমার মাথা খারাপ হল নাকি? দুপুর রোদে লালদীঘিতে পাক খাওয়া?

আসনের কোণে গা এলিয়ে দিয়ে প্রমীলা জবাব দিলে—পূর্ণ-সলিলা পুষ্করিণী প্রদক্ষিণ করায় পুণ্য আছে।

সুপ্রিয় হেসে বললে—নির্ঘাৎ তোমার মাথার গোলমাল ঘটেছে।

—আমারও তাই মনে হচ্ছে।

—তাহলে তো কোন ডাক্তারের কাছে যেতে হয়।

প্রমীলা তেমনি ভাবে বললে—তা গেলে মন্দ হয় না। তবে যে-সে ডাক্তার চিকিৎসা করতে পারবে না। আমার নিজস্ব ডাক্তারের কাছে যেতে হবে।

—বেশ, বল তার নাম-ঠিকানা। সেখানেই না হয় যাই।

উত্তরে প্রমীলা তার ভ্যানিটি ব্যাগ খুললে। একখানি ইংরেজীতে নাম-ঠিকানা-লেখা কার্ড বার ক'রে সুপ্রিয়র কোলের উপর রেখে বললে—এই আমার ডাক্তারের নাম-ঠিকানা।

সুপ্রিয়র বিস্ময়ের শেষ নেই। বললে—এ তো আমার ভিজিটিং কার্ড! আশ্চর্য্য করলে তুমি। এ তোমার ব্যাগের মধ্যে কেন?

নিমীলিত দুই চোখে আবেশ নেমেছে। অস্ফুটে বললে প্রমীলা—ওটা আমার আইডেন্‌টিটি কার্ড! মাঝে মাঝে পথে বেরুই। ওই কার্ড সঙ্গে থাকলে হারিয়ে যাবার ভয় থাকবে না কোন দিন। রক্ষা-কবচও বলতে পারো।

স্তব্ধ হল সুপ্রিয়। কিছুক্ষণ নীরব থেকে বললে—আজ তুমি একেবারে বর্ণনাতীত। তুমি অনন্যা।

মৃদু গুঞ্জনে প্রমীলা জবাব দিলে—আমি আপন স্বরূপে আপনি ধন্যা।

আর কোন কথা হল না। নীরব রইল সুপ্রিয়। নীরবে দুই চোখ মুদে ব'সে রইল প্রমীলা। ভাষার অতীত-লোকে পেঁাছেচে দু'জনে।

সে-এক দিনই গেছে।

সেই দিনের কথাই কি স্মরণে এলো দু'জনের, সে-রাত্রে বিনিদ্র রজনী যাপনের অবকাশে?

সকাল-বেলা সুপ্রিয় তার বাংলোর ড্রয়িংরুমে ব'সে চিঠি লিখছিল। খোলা জানলা দিয়ে রোদ এসে পড়েছে ঘরের মধ্যে। জানলার বাইরে গাছের মাথায় পাখীর কলকাকলি।

ঘরের কোলে প্রশস্ত বারান্দার প্রান্তে ব'সে আছে রামলাল। নূতন মনিবের খিদ্‌মদ্‌গার সে। সর্ব্ব সময় হাজির আছে। চিঠি ডাকে দেওয়া, লোকজনদের তলব করা, মনিবের ঘর পরিষ্কার রাখা এবং আরও কত টুকিটাকি কাজ রামলালের।

নূতন মনিবকে ভারী সমীহ করে সে। হয়ত ভয়ও করে। তাই সে সাধ্যপক্ষে তাঁর সামনে হাজির থাকে না। ঘরের বাইরে নীরবে ব'সে থাকে হুকুমের প্রতীক্ষায়।

—এই যে রামলাল! সাহেব আছেন তো?

স্লিপারের চটাপট্ শব্দ করতে করতে বারান্দায় উঠে এলো সুমিতা। তারপর 'আসতে পারি?' বলে ঘরের দরজার সুমুখে থম্‌কে দাঁড়াল।

কলম নামিয়ে রেখে হাসিমুখে সুপ্রিয় বললে—আসুন।

ঘরের মধ্যে ঢুকে সুমিতা বললে—কাজে ব্যাঘাত ঘটালাম না তো?

তেমনি হাসিমুখে সুপ্রিয় জবাব দিলে—ঘটলেই বা ব্যাঘাত? তাতে দুঃখিত বোধ করছি না মোটেই। বসুন।

টেবিলের সামনে চেয়ারখানা টেনে নিয়ে সুমিতা বসল। ঘরের চারধারে দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে বললে—এক রকম মন্দ হয়নি সাজানো-গোছানো। কি বলেন?

—মন্দ? চমৎকার হোয়েছে। যোগেশ বাবুর কাছে শুনলাম, আপনি নিজে দাঁড়িয়ে সব তদারক করেছেন। অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে।

সুপ্রিয়র কথায় খুসীতে উজ্জ্বল হল সুমিতা, বললে—আপনি আমাদের অতিথি। দেখাশোনা করা তো আমাদের কর্ত্তব্য। কিছু অসুবিধা বোধ করছেন না তো? ঠাকুরটা রান্নাবান্না করছে কেমন কে জানে!

—ভালই করছে। কোন অসুবিধা হচ্ছে না।

মনে মনে দমে গেছে সুপ্রিয়। এই ভাবে কথার পর কথার জাল যদি রচিত হতে থাকে তাহলে তার চিঠি-লেখার দফা গয়া।

সুমিতা বললে—কোন কিছু অসুবিধা হলে বা প্রয়োজন হলে বলতে সঙ্কোচ করবেন না। এখানে আপনার আত্মীয়-স্বজন কেউ নেই, আমরা থাকতে একথা যেন আপনাকে মনে করতে না হয়।

বাক্যের বাঁধুনি প্রশংসা পাবার যোগ্য। সুপ্রিয় বললে—অশেষ ধন্যবাদ। মনে রাখবো আপনার কথা।

সুমিতা বললে—আজ সন্ধ্যায় আমাদের ওখানে চা খাবেন।

—আজ সন্ধ্যায়? ব্যস্ত হল সুপ্রিয়—কিন্তু আজ তো বোধ হয় সম্ভব হবে না।

—কেন? ঈষৎ ব্যগ্রকণ্ঠে প্রশ্ন করলে সুমিতা।

সুপ্রিয় বললে—আজ বিকেলে আমার বোম্বাই-এর সহকারী পারেখ কলকাতা থেকে এখানে এসে পোঁছোবে। কাজেই তার বাসার ব্যবস্থা করা ইত্যাদি ব্যাপারে বোধ হয় সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে যাবে।

—আচ্ছা, তাহলে কাল?

হাসলে সুপ্রিয়—কালও নয়। অন্য দিন। আমি নিজে বলব। কেমন?

ঘাড় নেড়ে সুমিতা বললে—আচ্ছা তাই। ঠিক বলবেন তো?

—নিশ্চয় বলব।

কী মুস্কিলেই পড়েছে সুপ্রিয়! হঠাৎ ডাক দিলে—রামলাল।

—হুজুর। বলে ঘাড় নীচু করে রামলাল এসে দাঁড়াল দ্বারপ্রান্তে।

—চায়ের জল দেওয়া হয়েছে?

—জী।

—আচ্ছা।

রামলাল চলে গেল।

সুমিতা বললে—কাল বিকেল-বেলা এই দিকে আসছিলাম। রামলালের মুখে শুনলাম, প্রমীলাদির বাড়ী গেছেন। ওঁদের সঙ্গে আগে থেকেই আলাপ ছিল বুঝি ?

চিঠিপত্রগুলো গুছিয়ে রাখতে রাখতে সুপ্রিয় বললে—ছিল। কলকাতায় আমাদের বাড়ীর কাছেই ছিল ওঁদের বাসা। ভবতারণ বাবুর সঙ্গে আমার বাবার বিশেষ হৃদ্যতা ছিল।

—ও, তাই। উঠে দাঁড়াল সুমিতা—আজ যাই, অনেক কাজ প'ড়ে আছে।

—আসুন।

—সময় পেলে আসবেন আমাদের বাড়ী।

—নিশ্চয় আসবো।

—কথার ঠিক থাকবে তো ? হাসিমুখে ঘুরে দাঁড়াল সুমিতা।

হা ভগবান ! এমন বিপাকেও মানুষকে ফেলতে পারো তুমি !

সবেগে সুপ্রিয় বললে—নিশ্চয় ঠিক থাকবে।

চলে গেলে সুমিতা। প্রকাণ্ড এক হাঁফ ছেড়ে সুপ্রিয় ডাকল—রামলাল !

রামলালকে পূর্ববৎ দরজার কাছে দেখা গেল।

অসহনীয় পরিবেশ থেকে মুক্তি পেয়ে রামলালকেও এখন ভাল লাগছে সুপ্রিয়র। এই বৃদ্ধ বেয়ারার সঙ্গে কথা বলতে খুসী লাগছে

তার। সত্যিই মায়া হয় লোকটাকে দেখলে। আর কী অনুগত! ভোর থেকে আরম্ভ ক'রে যতক্ষণ না সুপ্রিয় নিদ্রা যায় ততক্ষণ ঠায় হাজির থাকে রামলাল।

সুপ্রিয় বললে—রামলাল, তোমাকে আমার খুব ভাল লাগে। তোমার মাইনে বাড়িয়ে দেব। তোমার কাজে খুসী হয়েছি।

বিড় বিড় ক'রে রামলাল জবাব দিলে—হুজুরের মেহেরবাণী।

সুপ্রিয় জিগেস করলে—কতদিন এই কোম্পানীতে কাজ করছ রামলাল?

ঢোঁক গিলে আমতা আমতা করে রামলাল বললে—আজ্ঞে, এই ছ'মাস হবে।

—মাত্র ছ'মাস! আমি মনে করেছিলাম, দশ-বিশ বছর হবে। আচ্ছা রামলাল, তোমার দেশ কোথায়?

রাম লালে ঘাড় আরও ঝুকে পড়ল, বললে—বিহার সরিফের এক গ্রামে। অজ পাড়াগাঁ হুজুর!

—সেখানে কে আছে তোমার?

—আছে? সবাই আছে হুজুর। রামলাল বলতে লাগল—জরু মরেছে। আছে ছেলে, মেয়ে, ছেলের বউ। ঘর-ভরা ছোট ছোট ছেলেমেয়ে। সুখের সংসার আমার।

ভাঙা-হিন্দি ভাঙা-বাংলায় মেশানো বুলি রামলালের কণ্ঠে ভারী অদ্ভুত শোনায়। অনেকদিন সে ঘর-ছাড়া, বাংলা দেশেই কেটেছে জীবনের বেশি সময়, তাই তার ভাষা অমন বিচিত্র।

সুপ্রিয় বললে—আমি চান করতে যাচ্ছি, রামলাল। হিতেন বাবু এলে বসতে বলবে।

রামলাল ঘাড় নাড়ল। সুপ্রিয় ভিতরের দিকে চলে গেল।

কাঁধের তোয়ালেখানা হাতে নিলে রামলাল। ঘরের আসবাব-পত্র ঝাড়-মোছ করতে লাগল। মনিব যখন থাকে না তখন সে এই সব কাজে মন দেয়। মিনিট পনেরো ধ'রে সে পাশাপাশি দু'খানি ঘরের দরজা-জানলা আসবাব-পত্রের সংস্কার সাধন করলে। তারপর এসে দাঁড়াল সুপ্রিয়র টেবিলের সামনে। পরম যত্নে চেয়ারখানিকে মুছলে। টেবিলের উপর ছোট-ফ্রেমে-আঁটা সুপ্রিয়র মায়ের ফটোখানি বসানো। সেদিকে তার দৃষ্টি পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে সে নিশ্চল স্তব্ধ হয়ে গেল। পলক পড়ছে না চোখে। ঠায় সেই ফটোর দিকে তাকিয়ে আছে। ঘাড় ঝুঁকে পড়েছে। বিড় বিড় ক'রে কি যেন বলছে।

ঘরে ঢুকলো হিতেন। রামলাল তন্ময়, জানতে পারল না। হিতেন তাড়া দিয়ে উঠল—এই উল্লু, সাবকো মেজ পর কেয়া করতা ?

চমকে উঠল রামলাল। ভয়ে কুঁকড়ে গেল। ঘাড় নীচু করে সরে যেতে লাগল দরজার দিকে। হিতেন খেঁকিয়ে উঠল—চোট্টা কাঁহাকা! কি নিয়েছিস টেবিল থেকে ?

—কিছু নিইনি হুজুর!

—আলবৎ নিয়েছিস। সাহেবের মনিব্যাগে হাত দিয়েছিস।

—না, হুজুর! রামলাল কাঁপছে ভয়ে।

—না ? গর্জে উঠল হিতেন—হাম নেহি দেখা, ক্যা ?

মারে আর কি!

চেঁচামেচি শুনে বেরিয়ে এলো সুপ্রিয়। তখনো তার চুল আঁচড়ানো শেষ হয়নি।

—ব্যাপার কি হিতেন বাবু?

হিতেন বললে—দেখুন না কাণ্ড! বুড়ো বেটা আপনার টেবিলের জিনিষ-পত্রে হাত দিচ্ছিল। হাতে-নাতে ধরা পড়েছে! দেখুন তো আপনার পার্স টা খুলে, টাকাকড়িগুলো ঠিক আছে কি না।

মনিব্যাগ টেবিলের উপরেই রেখে গিয়েছিল সুপ্রিয়। কিন্তু সেদিকে সে মনোযোগ দিলে না। রামলালের দিকে দৃষ্টি পড়ল তার। রামলালের সর্ব্বদেহ কাঁপছে। মুখখানা যেন কেমন বিহ্বল হয়ে গেছে। কী করুণ আর অসহায় মূর্ত্তি!

নরম গলায় সুপ্রিয় বললে—রামলাল, তুমি বাইরে গিয়ে বোসো গে। তোমার কোন ভয় নেই।

সুপ্রিয়র কথা শুনে ঈষৎ সোজা হ'য়ে দাঁড়াল রামলাল। হাত-পায়ের কাঁপুনি থামল। যেন প্রাণ ফিরে পেল সে। ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

ব্যস্ত হয়ে হিতেন বললে—টাকাগুলো একবার মিলিয়ে•••

—টাকা ঠিকই আছে হিতেন বাবু! রামলাল চোর নয়। এখন শুনুন। গোটা দুই কাজের কথা আছে।

—বলুন।

ক্ষণেকের জন্যে কি যেন ভাবল সুপ্রিয়। তারপর বললে—আজ বিকেলে পারেখ আসছে। উপস্থিত গেষ্ট-হাউসে তার থাকার ব্যবস্থা করে দেবেন।

—আজ্ঞে, সে তো ঠিক করাই আছে।

—আর, আপনি নিজে একটু তার দেখাশোনা করবেন। আমার মতো সে-ও আপনাদের অতিথি।

ঘাড় নেড়ে হিতেন বললে—আপনি নিশ্চিন্ত থাকবেন। আমার ওপর যে-কাজের ভার দিলেন তাতে ক্রটি ঘটবে না।

—ভাল লাগল আপনার কথা শুনে। বললে সুপ্রিয়—আর একটা কথা, কাল থেকে আমি কাজে লাগতে চাই। রীতিমতো আপিসে বসব। আপনি সবাইকে বলে দেবেন। যোগেশ বাবুকে একবার দেখা করতে বলবেন। হিসেবপত্রের ব্যাপারটা চটপট চুকিয়ে ফেলবো মনস্থ করেছি। তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে আমায়।

হিতেন বললে—মাস তিনেক থাকবেন তো শুনেছি।

সুপ্রিয় আবার অন্যমনস্ক হয়েছে। হিতেনের কথার উত্তরে কতকটা আপনমনেই বললে—তিন মাস! সে যে অনেক দিন।

* * *

সন্ধ্যার সময় প্রমীলা নিজের ঘরে শুয়েছিল। এলোমেলো চিন্তা। বিপর্য্যস্ত মন। কাল রাতে ঘুমের সঙ্গে ঘটেছে বিরোধ। আজ সারাদিন আহারের সঙ্গে। ক্লান্ত শরীর আর অবসন্ন মন নিয়ে প্রমীলা নিরতিশয় বিমূঢ় আর অসহায় বোধ করছে।

—ভিতরে আসবো, প্রমীলাদি!

পরিচিত কণ্ঠস্বর শুনে উৎফুল্ল হল প্রমীলা। উঠে ব'সে বললে —আয়, শোভা, আয়। বাঁচালি আমায়!

অসংলগ্ন কথা। শোভা ঘরে ঢুকে এক মুহূর্ত্তে থমকে দাঁড়াল।

তারপর হাসিমুখে বললে—তোমায় বাঁচালাম ? সে আবার কি কথা হল ! তোমায় বাঁচাবার লোক তো আমি নই। তবে তিনি আছেন কাছেই। ডেকে আনবো ?

প্রমীলার বুঝতে দেরী হল না শোভা কার কথা বলছে। সুমিতার মারফৎ যোগেশের বিজয়-বার্ত্তা বিঘোষিত হতে দেরী হয়নি ! ম্লানমুখে ঈষৎ হেসে বললে—তোকে কষ্ট করতে হবে না। আমি নিজেই ডেকে নিতে পারবো। কিন্তু তুই একা যে ! সুমিতারা কই ?

বিছানার এক প্রান্তে ব'সে শোভা বললে—তাদের আর পাত্তা পাওয়া যাবে না। বিশেষ করে সুমিতার। সে হারিয়ে গেছে।

—তাই নাকি ! কবে থেকে ?

—বোম্বাই থেকে নতুন অতিথি যবে এসেছেন তবে থেকে। শোভা উত্তেজিত হল—ঢের ঢের হ্যাংলা মেয়ে দেখেছি প্রমীলাদি, কিন্তু সুমিতা সবাইকে টেক্কা দিয়েছে ! ছি ছি।

—এত রাগ ! প্রমীলা হেসে ফেললে।

—হবে না ! শোভা উত্তপ্তকণ্ঠে বললে—আমাদের সবাইকার প্রেস্‌টিজ ডোবালে ও। সকাল নেই, বিকেল নেই, সন্ধ্যে নেই, সব সময়েই সুপ্রিয় বাবুর বাড়ী দৌড়োচ্ছে। ভদ্রলোক কী ভাবছেন, কে জানে ?

—হয়ত ভালই ভাবছেন। বললে প্রমীলা।

—কে জানে। হতেও পারে। শোভা বললে—সকাল-বেলায় দেখা হল, হন্‌ হন্‌ করে চলেছে, বললে, ওঁকে বিকেলে চায়ের নেমন্তন্ন করতে যাচ্ছি ! কি গদগদ ভাব, যদি দেখতে। লজ্জা নেই,

বললে কি না, আমাকেই ভাই সব দেখাশোনা করতে হচ্ছে, রান্নাবান্না খাওয়া-দাওয়া, সমস্ত।

শোভা থামল। প্রমীলা হাসছে। বেশ প্রাণ খুলেই হাসছে। শোভা বললে—হাসছ কি! কোন দিন হয়ত শুনবো, সাহেবের বাড়ীতে বসে সুমিতা বাটনা বাটছে!

কৌতুক সহকারে প্রমীলা বললে—কিন্তু তোর এত রাগ কেন? প্রতিযোগিতায় নেমে হেরে গেছিস নাকি?

রেগে হেসে ফেললে শোভা। বললে—আমার অমন পোড়া-কপাল নয়। আর কেউ না জানুক, তুমি তো জানো আমার সব খবর। সুতরাং ও বদনাম দিতে পারবে না।

প্রমীলাও হাসতে লাগল, বললে—তা বটে। ভুলে গিছলাম যে তোর মনের মানুষ বাঁধা আছে মনের ঘরে। চিঠিপত্র আসছে?

—আসছে বৈ কি! আজই তো পেয়েছি। মস্ত বড় চিঠি।

শোভার সঙ্গে ভাব হয়েছিল যে-ছেলেটির, তাকে পছন্দ করেনি তার দাদা হিতেন। শোভার জেদ কিন্তু নুয়ে পড়েনি। সে পণ ক'রে ব'সে আছে তাকে ছাড়া অন্য কাউকে সে বিয়ে করবে না। বিনয় ছেলেটি ভাল। পাবলিক সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে নূতন চাকরিতে ঢুকেছে। পত্রালাপ আছে নিয়মিত। বিনয় শোভাকে জানিয়েছে যে প্রথম সুযোগেই সে বন্দিনী রাজকন্যাকে উদ্ধার করে নিয়ে আসবে। প্রমীলাকে প্রথম থেকেই শোভার ভাল লেগেছিল। তাই তার গোপন কথা প্রমীলার কাছে প্রকাশ করে সে আনন্দ বোধ করেছে।

শোভার কথা শুনে প্রমালা প্রশ্ন করলে—কি লিখেছে? বল্ না, শুনি!

—চিঠি সঙ্গেই আছে। কিন্তু পড়তে লজ্জা বোধ হচ্ছে যে!

—বলিস কি রে। চিঠি সঙ্গে নিয়ে ঘুরছিস! প্রমীলার কণ্ঠস্বরে কৌতুক ঝরে পড়ল।

শোভা জবাব দিলে—ওই তো সম্বল। রক্ষা-কবচও বলতে পারো!

শোভার কথা শুনে অন্যমনস্ক ভাবে ধীরে ধীরে প্রমীলা বললে—খুব সাবধানে রাখিস। হারিয়ে না যায়।

ব্লাউজের ভিতর থেকে বার হল নীলাভ খাম। ব্রীড়ার শোভায় অপরূপ দেখাচ্ছে শোভাকে! নিষ্পলক নেত্রে তার মুখের পানে তাকিয়ে আছে প্রমীলা।

—সবটা পড়ব না কিন্তু। খানিকটা প'ড়ে শোনাই। বললে শোভা।

প্রমীলা প্রফুল্ল হবার চেষ্টা করলে; হেসে বললে—ক্ষীরটুকু বাদ দিয়ে নীরটুকু? তাই পড়। শুনে কানে আঙুল দিতে হয় এমন ক্ষীরাংশই বুঝি বেশী?

—আঃ! কী যে বল। মুখে আটকায় না কিছুই। শোন। শোভা পড়তে লাগল,—

"অনেক কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে তোমাকে আর আমাকে। আমাদের জন্যে স্বর্গ-খেলনা নয়—এই বাণীটি সব সময় মনে রেখো। অনুশাসন আর বাধা-নিষেধের দুর্লঙ্ঘ্য পাহাড় পার হতে হবে তোমায়।

পথের ধারে তোমার জন্যে আমি অপেক্ষায় আছি, এই কথাটি মনে করে সাহস এনো অন্তরে। তোমার আমার মধ্যে যে সত্য আছে তার জয় অবধারিত। তোমার আত্মীয়রা যে অনুশাসন দিয়ে তোমাকে বাঁধতে চাইছেন তার মধ্যে যুক্তি হয়ত আছে কিন্তু তোমার জীবনের চেয়ে সে যুক্তি বড় নয়। তোমার আমার মধ্যে যে সম্বন্ধ যে সম্পর্ক গড়ে উঠেছে তা ক্ষণকালের নয়, শুধু এ জীবনের নয়, তা অনাদি কালের, বহু জীবনের।

'আমরা দুজনে ভাসিয়া এসেছি যুগল প্রেমের স্রোতে
অনাদিকালের হৃদয় উৎস হোতে।'

মন দিয়ে আমাকে যদি সত্যিকারের গ্রহণ করে থাকো, তাহলে কোন দ্বিধা যেন তোমাকে দুর্ব্বল না করে, কোন সংশয় যেন পীড়া না দেয়, গুরুজনের অনুশাসন যেন তোমাকে সত্য পথ থেকে বিচলিত না করে। আমাকে বরণ করে তুমি হয়ত তোমার গুরুজনের মনে দুঃখ দেবে, কিন্তু তোমার আমার জীবনের চিরকালের কল্যাণের চেয়ে সে-দুঃখ বড় নয়, তাকে স্বীকার ক'রে জীবনের সার্থকতাকে অস্বীকার করবার মধ্যে ত্যাগের মহিমা খুজে পাবে না, অচিরকালেই বুঝবে, সে-ত্যাগের দ্বারা তুমি আর-একজনের প্রতি চরম অবিচার করেছো।"

শুনতে শুনতে বিহ্বল হয়ে গেল প্রমীলা। সহসা শোভার দু'হাত চেপে ধ'রে বলে উঠল—শোভা!

—কি প্রমীলাদি'!

—না, কিছু না। পড়্।

—আর নেই। এখানেই শেষ।

প্রমীলা ঘাড় নাড়ল—আর-কিছু থাকতেও পারে না। তোরা ধন্য। তোদের আশীর্ব্বাদ করি।

চিঠিখানি সযত্নে যথাস্থানে রেখে দিয়ে শোভা বললে—এখানে তুমিই আমার একমাত্র হিতৈষী, তা আমি মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করি প্রমীলাদি! তাই আমাদের যাত্রা যেদিন শুরু হবে সেদিন অন্য কাউকে হয়ত কাছে পাবো না, কিন্তু তুমি যেখানেই থাকো, তোমাকে আনবো ডেকে। সব কাজের ভার নিতে হবে তোমায়।

—আমাকে! আর্ত্ত শোনাল প্রমীলার কণ্ঠস্বর—আমাকে কোন মঙ্গল-কাজে ডাকিসনে, শোভা, আমাকে ডাকিস নে।

আশ্চর্য্য হল শোভা। বললে—সে কি! সুমিতার মুখে সব শুনেছি। আগামী মাসেই তোমাদের বিয়ে হবে। সুমিতা বললে, যোগেশদা' অধীর আগ্রহে দিন গুণছেন। কি হল! প্রমীলাদি!

—কিছু না। বড্ড মাথা ধরেছে। শোভা, একটা গান কর। অনেক দিন তোর গান শুনি নি।

প্রমীলার কথায় মাথা দুলিয়ে শোভা বললে—বা রে, আমি আজ এসেছিলাম তোমার গান শুনতে। কতদিন সাধ্য-সাধনা করেছি। আজ না শুনে ছাড়বো না।

—আমার গান! সহজ কণ্ঠে প্রমীলা বললে—সে তো পুরনো যুগের কাহিনী। এখন অচল। এখন তোদের পালা। আমাদের দিন গেছে। তোদের হল শুরু, আমার হল সারা।

শোভা প্রতিবাদ করলে সজোরে—কী যে বল! তোমার কাছে আমরা! তোমার গানের কাছে আমাদের গান! সভাসমিতি-জলসাতে

তোমার পাশে থাকি আমরা, কিন্তু আমাদের দিকে কেউ ফিরেও তাকায় না!

—দূর! পোড়ারমুখী!

ঘাড় দুলিয়ে শোভা বললে—সত্যি! আমার কি মনে হয় জান প্রমীলাদি!

—কি মনে হয়?

—তুমি নিজেকে ঠিক মতো জান না। এখনো হয়ত নিজেকে চিনতে পারোনি। তোমার চোখের দৃষ্টি থাকে একদিকে, মনের দৃষ্টি অন্যদিকে! তোমাকে কল্পনা করেই হয়ত কবি লিখে গেছেন—

তুমি অনন্যা
তুমি আপন স্বরূপে আপনি ধন্যা!

তোমায় দেখে মাঝে মাঝে আমার ধাঁধা লাগে। যেমন এখন লাগছে।

—আঃ! তোর কথার জ্বালায় আমি গেলাম। প্রমীলা রীতিমতো অসহিষ্ণু হোয়ে উঠল—বন্ধ কর্ তোর বচন-বিন্যাস।

—বন্ধ করলাম।

—গান ধর্।

—ধরলাম।

শোভা গাইতে লাগল:

"বিদায় করেছো যারে নয়ন জলে
এখন ফিরাবে তারে কিসের ছলে।"

কান পেতে শুনতে লাগল প্রমীলা। অনুভব করলে সমস্ত অন্তর দিয়ে।

"ছিল তিথি অনুকূল
শুধু নিমেষের ভুল
চিরদিন তৃষাকুল পরাণ জ্বলে।
মধুরাতি পূর্ণিমার ফিরে আসে বার বার
সে-জন ফেরে না আর যে গেছে চলে।"

গান শেষ হল। প্রমীলার মুখে কথা নেই। বহুক্ষণ কাটল নীরবে। তারপর শোভা বললে—আমার আবার গান! তুমি একটা গান শোনাও, লক্ষ্মীটি, প্রমীলাদি।

—আমি! প্রমীলা যেন ঘুম থেকে উঠল। বললে—কোন গানই যে মনে আসছে না শোভা!

শোভা বললে—রেকর্ডে যে-গান গেয়ে বহুজনের চিত্তহরণ করেছো, সেই গানটি তোমার মুখে শুনতে চাই।

—তোর ডেঁপোমির আর অন্ত নেই! হাসল প্রমীলা—রেকর্ডে তো শুনেছিস সে-গান কতবার।

—মন ভরেনি। তুমি সামনে ব'সে গাইবে, আমি একা শুনবো। স্মরণীয় হ'য়ে থাকবে সে-অভিজ্ঞতা আর আনন্দ।

বাক্‌পটুতায় শোভা কম নয়। শেষ পর্য্যন্ত গাইতে হল প্রমীলাকে—

"শুধু তোমার বাণী নয় গো, হে বন্ধু, হে প্রিয়
মাঝে মাঝে প্রাণে তোমার পরশখানি দিও।"

মৃদু-কম্প্র-কণ্ঠস্বর প্রাণের স্পর্শ পেয়ে ক্রমে সজীব হল। সুরের সঙ্গে মিশ্‌ল আবেগ। অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্যে ঘরের বাতাস হল মন্থর।

"সারা পথের ক্লান্তি আমার সারা দিনের তৃষা
কেমন ক'রে মেটাবো যে খুঁজে না পাই দিশা,
এ আঁধার যে পূর্ণ তোমায় সেই কথা বলিও।"

ঘরের সীমানা ছাড়িয়ে করুণ সুর-ঝঙ্কার পরিব্যাপ্ত হল দূর-দিগন্তে। ঠিক সেই ক্ষণে পল্লীর অপর প্রান্তের মৃদু-আলোকিত আর-একটি ঘরে সেই গানেরই সুর অনুরণিত হচ্ছিল।

নিজের ঘরে বসে সুপ্রিয় তার গ্রামোফোন খুলেছে। রেকর্ডে সেই গানখানিই বাজছে :

"হৃদয় আমার চায় যে দিতে কেবল নিতে নয়,
বয়ে বয়ে বেড়ায় সে তার যা কিছু সঞ্চয়।"

তন্ময়-চিত্তে প্রমীলা গাইতে লাগল :

"হাতখানি ঐ বাড়িয়ে আনো, দাও গো আমার হাতে,
ধরবো তারে ভরবো তারে রাখবো তারে সাথে,
একলা পথে চলা আমার করবো রমণীয়।"

এ-ঘরে ব'সে গাইছে প্রমীলা। ও-ঘরে বাজছে তার রেকর্ড। মধ্যে ছোট একটি প্রান্তর। কিন্তু সেই ছোট ব্যবধান আজ যেন দিক্‌বিহীন।

স্মৃতির সমুদ্র মন্থিত হল বুঝি! প্রমীলার মনে পড়ল একদিন এই গান সে সুপ্রিয়কে শুনিয়েছিল। তার নিজের হাতে রচনা-করা ফুলের বাগানে ব'সে সে গেয়েছিল এই গান, আর তার অদূরে ব'সে তার মুখের পানে তাকিয়ে সুপ্রিয় শুনেছিল এই গান।

গানের প্রথম লাইনের একটি কথা একটুখানি বদল ক'রে গেয়েছিল প্রমীলা :

"শুধু তোমার বাণী নয় গো হে বন্ধু, সুপ্রিয়,
মাঝে মাঝে প্রাণে তোমার পরশখানি দিও।"

সুপ্রিয়র মনের পটে একই সময়ে সেই একই ছবি ভেসে উঠেছে। চোখের সামনে ভেসে উঠেছে পুষ্পভারানত সহকার-শাখার সেই সলজ্জ অভিসার-সজ্জা, আজন্ম-সাধনা-লব্ধ প্রিয়-বান্ধবীর সেই লাজ-নম্র মধুর অভিব্যক্তি, গানের একটি শব্দ বদল ক'রে গাইবার সময় তার দু'চোখের সেই মধুর আবেশ ঃ

"শুধু তোমার বাণী নয় গো হে বন্ধু, সুপ্রিয়।
মাঝে মাঝে প্রাণে তোমার পরশখানি দিও।"

গান শেষ হল। শোভা হঠাৎ প্রমীলার পায়ের কাছে মাথা নুইয়ে তার পায়ের ধূলো নিলে। ব্যস্ত হয়ে তার দু'হাত ধ'রে ফেলে প্রমীলা বললে—এ কী কাণ্ড! হঠাৎ প্রণাম কেন?

মৃদু হেসে শোভা জবাব দিলে—তোমাকে দিদি বলে মানি। প্রণাম করতে দোষ কি?

প্রমীলা অপ্রস্তুত হল—তাই বলে সময় অসময় নেই?

শোভা উত্তর দিলে—কেন জানি মনে হল, তোমাকে প্রণাম করবার এর চেয়ে উপযুক্ত সময় আর নেই।

* * * * *

একাধিক কারণে যোগেশ নিরতিশয় উদ্বিগ্ন এবং উদ্ব্যস্ত বোধ করছে। জগুয়াকে নিভৃতে ডেকে বলেছে, দুঃসময় আসছে খনি-শ্রমিকদের জীবনে, সে লড়বে তাদের জন্যে শেষ পর্য্যন্ত, জগুয়া যেন তার পাশে থাকে।

উত্তরে জগুয়া জানিয়েছে, সে হুজুরের গোলাম। প্রাণ দিতে প্রস্তুত আছে। প্রাণ নিতেও।

কিন্তু মহিমবাবুকে কিছুতেই বাগ মানানো যাচ্ছে না। চল্লিশ হাজারের হিসাবটার সমাধান এখনো হয়নি। মহিম স্পষ্টই জানিয়ে দিয়েছেন, নূতন করে খাতা তৈরী করা বা অন্যায়-ভাবে কোন হিসাব খাড়া করা তাঁর দ্বারা সম্ভব নয়, হাজার কেন, দশ হাজার, একশো হাজার টাকার বিনিময়েও নয়।

মহিমবাবুর কথা শুনে মনে মনে জ্বলে উঠেছে যোগেশ। মুখে শান্তকণ্ঠে বলেছে, তিনি যা ভাল বুঝবেন তাই যেন করেন।

সারাদিন তার কেটেছে নিদারুণ অস্বস্তির মধ্যে। সন্ধ্যাবেলা সে প্রমীলার বাড়ী হাজির হল, এবং সোজা পিসিমার ঘরে উঠে গেল।

দোতলায় দুখানি ছোট ঘর। তার একখানি পিসিমার। যোগেশ যখন পিসিমার সঙ্গে নানা সাংসারিক ও বৈষয়িক বিষয়ে আলোচনা বা তাঁর সঙ্গে গল্পগুজব করে তখন ইচ্ছা করেই প্রমীলা সেখানে থাকে না।

—কেমন আছেন পিসিমা? ব'লে যোগেশ ঘরে ঢুকতেই পিসিমা বললেন—তিন চার দিন দেখা পাইনি কেন বাবা? শরীর ভাল আছে তো?

পিসিমা শয্যার উপর উঠে বসলেন। যোগেশ চেয়ারখানা টেনে নিয়ে ব'সে বললে—শরীরের গোলমাল নেই। কাজের গোলমাল চলছে। তাও শীগগিরই মিটে যাবে। সেই ঝঞ্ঝাটের জন্যেই আসতে পারিনি।

—মিলির সঙ্গে দেখা হয়েছে?

—হয়েছে। রান্নাঘরে রয়েছে দেখলাম।

পিসিমা বললেন—হ্যাঁ, ঠাকুরটা আজ আবার আসেনি। ছুটি নিয়ে গেছে নাকি।

কয়েক মুহূর্ত্ত নীরব থেকে যোগেশ বললে—বোম্বাই থেকে নতুন কর্ত্তা যিনি এসেছেন, তিনি গোল পাকাচ্ছেন। ঝক্কি তো সব আমারই কিনা।

পিসিমা মন্তব্য করলেন—গোল পাকালে চলবে কেন? তুমি সব ঠিক ক'রে দাও না! নতুন মানুষ, তাই বোধ হয় কাজে হদিস পাচ্ছে না।

ঘাড় নেড়ে যোগেশ বললে—তাই বোধ হয় হবে। ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ করে জানলাম কাকাবাবুর সঙ্গে তাঁর বিলক্ষণ চেনা ছিল, তাঁর বাবা আর কাকাবাবু নাকি দু'জনে খুব বন্ধু ছিলেন, কলকাতায় থাকতেন কাছাকাছি।

পিসিমা অনুসন্ধিৎসু হলেন, প্রশ্ন করলেন—নাম কি বল তো তার আর তার বাপের?

—ভদ্রলোকের নাম সুপ্রিয় মুখুজ্যে, বাপের নাম প্রিয়নাথ মুখুজ্যে। চেনেন নাকি?

ভাইএর কাছে সমস্তই শুনেছিলেন তিনি। জেনেছিলেন সব খবর। যোগেশের কথা শুনে ভীষণ চমক লাগল তাঁর। মাথা নেড়ে বললেন—আমি চিনি নে, তবে নাম শুনেছি দাদার মুখে।

যোগেশ বললে—প্রমীলার সঙ্গেও ভদ্রলোকের আলাপ আছে। একদিন তো এসেছিলেন এখানে। আপনার সঙ্গে দেখা হয়নি?

আবার চমক লাগল। উত্তরে বললেন পিসিমা—না। বোধ হয় আমার শরীর খারাপ ছিল বলে প্রমীলা আমার কাছে আনেনি।

ক্ষণকাল কাটল চুপচাপ। তারপর যোগেশ বললে—একটা কথা বলতে এসেছিলাম পিসিমা।

—বল বাবা।

একটু ইতস্ততঃ করে যোগেশ বললে—পুরুত মশায় দিন তো একটা স্থির করেছেন সামনের মাসে। দেরী আছে তার। আমি বলছিলাম কি, ইতিমধ্যে আশীর্ব্বাদটা সেরে রাখলে হয় না? অবিশ্যি আপনি যা ভাল বুঝবেন!

মাথা নেড়ে পিসিমা বললেন—ভাল কথাই বলছো। আমিও তাই ভাবছিলাম। তুমি বাবা পুরুত মশাইকে একটা দিন দেখতে বল, যত তাড়াতাড়ি হয়।

—বলব, এবং তাঁকে আপনার কাছে পাঠিয়ে দেব।

—দিও। হ্যাঁ, আর শোনো বাবা, প্রিয় মুখুজ্যের ছেলেকে বোলো যেন একবার আমার সঙ্গে দেখা করে সময় মতো। দাদার সঙ্গে তাদের অনেক দিনের পরিচয় ছিল, তাই একটু আলাপ করব, এই আর কি!

—ব'লে দেব পিসিমা। আজ তাহলে উঠি।

—এসো বাবা।

নীচে নেমে প্রমীলার সঙ্গে দু'চারটে সাধারণ আলাপ শেষ ক'রে যোগেশ চলে গেল।

যোগেশের মুখে খবরটা শুনে পর্য্যন্ত পিসিমা ফুলছিলেন। কিছুক্ষণ পরে প্রমীলা ঘরে এলে বললেন—হ্যাঁ রে, একটা কথা জিগেস করি!

—কি কথা পিসিমা ?

ভিতরের অগ্ন্যুৎপাত বাইরে ধরা পড়ল না, যথাসম্ভব নরমগলায় তিনি বললেন—তোদের কলকাতার পড়শি প্রিয় মুখুজ্যের ছেলে সুপ্রিয়ই নাকি যোগেশদের কর্ত্তা হোয়ে এখানে এসেছে ?

পিসিমা খবরটা পেয়েছেন তাহলে ! প্রমীলা বললে—হ্যাঁ, তাই তো শুনছি।

—সুপ্রিয় নাকি একদিন আমাদের বাড়ী এসে তোর সঙ্গে দেখা করে গেছে ?

—হ্যাঁ।

—কই, বলিসনি তো আমায় !

মুহূর্ত্তকাল নীরব থেকে প্রমীলা জবাব দিলে—এমন কোন জরুরী বা গুরুতর ঘটনা নয়, তাই তোমায় বলতে খেয়াল ছিল না।

প্রমীলার জবাব দেবার ভঙ্গীটি পিসিমার কান এড়াল না। আরও নরম সুরে বললেন—দাদার সঙ্গে তাদের খুবই আলাপ ছিল। শুনেছি তো সবই। এসেছে জানলে আমিও একটু আলাপ করতাম। এবার এলে আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিস। কেমন ?

মনে মনে যৎপরোনাস্তি শঙ্কিত হয়ে মুখে বললে প্রমীলা—দেব।

* * * *

ঘটনার স্রোত দ্রুত ধাবিত হল। দুর্ব্বার হল তার গতি। বারে বারে প্রতিহত হয়ে আবর্ত্তের সৃষ্টি হল। তরঙ্গ বিক্ষোভে কূল ভাঙার গর্জ্জন শোনা যেতে লাগল।

পারেশ এসেছে। এবং এসেই কাজে লেগেছে। কোন্ দিকে

কোন্ কাজে সে লেগে থাকবে, কর্ত্তার কাছ থেকে তার নির্দ্দেশ নিয়ে এসেছে। আপিসের ভিতরকার কোন কাজ তার নয়। তার কাজ বাইরে। লক্ষ্য রাখা, সংবাদ রাখা, কোন্ শ্রমিক কোন্ দলের অন্তর্ভুক্ত, কে কার বিরুদ্ধে, কে বা কার অনুগত।

চতুর পারেখ দু'দিনেই অনেক খবর সংগ্রহ করেছে। লক্ষ্য করেছে জগুয়ার বেপরোয়া চলাফেরা, লক্ষ্য করেছে যোগেশের প্রতি তার আনুগত্য, লক্ষ্য করেছে যোগেশের গতিবিধি।

শ্রমিকদের মধ্যে দুটো দল আছে। একদলের নেতা জগুয়া। অন্য দল মান্য করে বুড়ো রামলালকে। ইতি পূর্ব্বে এখানকার শ্রমিক জগতের একছত্র আধিপতি ছিল জগুয়া। বুড়ো সর্দ্দার রামলাল এসে জগুয়ার রাজত্বে ভাগ বসিয়েছে। সেজন্যে রামলালের প্রতি জগুয়ার জুগুপ্সা আর বিদ্বেষের অন্ত নেই। এ তথ্য পারেখ কতক জেনেছে এবং কতক বুঝে নিয়েছে।

আজ ক'দিন হল, নূতন কয়েকটা নির্দ্দেশ জারী হয়েছে। সেই আদেশগুলি ঠিকমত প্রতিপালিত হচ্ছে কিনা, সে-সম্বন্ধে লক্ষ্য রাখতে গিয়ে পারেখ দেখেছে একমাত্র জগুয়া ছাড়া অন্য সকলেই সেগুলির গুরুত্ব উপলব্ধি করেছে।

*   *   *

কাজের মধ্যে ডুব দিয়েছে সুপ্রিয়। যত শিগ্‌গির পারে, এখানকার ব্যবস্থা সে সম্পূর্ণ করতে চায়। ফিরে যাবে সে বোম্বাই। আজই যদি যেতে পারতো তাহলে কালকের জন্যে অপেক্ষা করত না। এত তার ত্বরা।

পারেখের কাছে সে নিয়মিত সকল সংবাদই পাচ্ছে। বুঝেছে, যত সহজে কাজ শেষ হবার আশা করেছিল তত সহজে তা হবে না।

যোগেশের কথাবার্ত্তা এবং আচরণে আকস্মিক পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করেছে সুপ্রিয়। হেসেছে মনে মনে। সেই সঙ্গে কঠিনও হয়েছে। কোন কারণে কোন অবস্থায় সে শেঠজির দেওয়া গুরু-দায়িত্ব সম্পাদনে শিথিল হবে না। কর্ত্তব্যচ্যুতির পথ তার জানা নেই।

সেদিন আপিসে ব'সে যোগেশকে তলব করলে সুপ্রিয়। কিছুক্ষণ পরে যোগেশ এসে দাঁড়াল। সুপ্রিয় বললে—বসুন, যোগেশবাবু।

যোগেশ আসন গ্রহণ ক'রে নীরবে সুপ্রিয়র পরবর্ত্তী কথার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল।

হাতের লেখাটা শেষ ক'রে সোজা হ'য়ে ব'সে সুপ্রিয় বললে—এইবার তাহলে হিসেবটা বুঝিয়ে দিন, পরশুর মধ্যে একটা ট্রায়াল ব্যালান্স্ তৈরী ক'রে ফেলতে চাই।

সুপ্রিয়র কথা শুনে অন্তরে কাঁপন ধরল বুঝি যোগেশের। মুখে শান্তকণ্ঠে বললে—সে-হিসেব মহিমবাবু আপনাকে বুঝিয়ে দেবেন।

মাথা নাড়ল সুপ্রিয়, বললে—তা দেবেন। আপত্তি নেই। কিন্তু আপনি থাকবেন তাঁর সঙ্গে। আমার কথাবার্ত্তা বা প্রশ্ন যদি কিছু থাকে তা হবে আপনার সঙ্গে। আপনার কাছ থেকেই আমি সব বুঝে নেব। সেই রকমই নির্দ্দেশ আছে।

—কেন, মহিমবাবু বুঝিয়ে দিলে হবে না? তিনিই তো হিসেব-পত্র লেখেন!

—লেখেন তিনি। তবে দায়িত্ব আপনার।

কয়েক সেকেণ্ড নীরব থেকে যোগেশ বললে—আচ্ছা, তাই হবে। আর কিছু বলবেন ?

কিছুক্ষণ কি ভাবল সুপ্রিয়। তারপর নম্রকণ্ঠে বললে—যে-সব নতুন আইনের প্রবর্ত্তন করেছি সেগুলো যেন সবাই মানে, তার প্রতিও নজর দেবার ভার আপনার।

—নজর দেব। তবে মানা না মানা তাদের ইচ্ছে। তাদের ইচ্ছের ওপর আমার জোর খাটবে কেন ?

যোগেশের কথায় সুপ্রিয়র মুখে হাসি দেখা দিল। মাথা নেড়ে বললে—এতদিন তাদের ওপর কর্ত্তৃত্ব ক'রে তাদের বাধ্য করতে পারবেন না, এটা তো আনন্দের কথা নয়।

তর্ক করবার ঝোঁক চেপেছে যোগেশের। বিরস মুখে জবাব দিলে—আমার বাধ্য তারা চিরদিনই।

—তবে কেন আপনার কথা মানবে না ?

সেই ভাবেই আবার জবাব দিলে যোগেশ—আমার কথা তারা নিশ্চয়ই মানবে। কিন্তু অন্যের কথা মানবে কি না তা আমি কেমন ক'রে জানবো ?

ভুরু কুঞ্চিত হ'ল সুপ্রিয়র।

—ও, আপনি বলছেন, আমার কথা তারা মানবে না। তাই না ?

যোগেশ চুপ করে রইল।

সুপ্রিয় বললে—তারা হয়ত জানে না, কিন্তু আপনি তো জানেন, এখানে কাজ করতে হলে আমার কথা মানা দরকার। আমি এখানে

এসেছি শেঠ্ রনছোড়দাসের প্রতিনিধিরূপে। আপনি দয়া করে এই তথ্যটা তাদের বুঝিয়ে দেবেন।

—চেষ্টা করব।

—ধন্যবাদ। তাহলে কাল দশটায় মহিমবাবুকে নিয়ে আপনি আসবেন। আচ্ছা!

কথা শেষ করে সুপ্রিয় আবার লেখার প্রতি মন দিলে। যোগেশ চলে গেল।

কিছুক্ষণ পরে এলো পারেখ।

তাকে দেখে হাসিমুখে সুপ্রিয় বললে—এসো, পারেখ, বোসো। ভগ্নদূতের মতো আজ আবার কি সংবাদ এনেছ, বল।

মুখের অস্ফুট শব্দ করে পারেখ বললে—আপনি হাসছেন। কিন্তু আমি হাসতে পারছি না।

—তাই নাকি। হাসতে লাগল সুপ্রিয়। বললে—তাহলে তো ভাবনার কথা।

—ভাবনার কথাই তো। গলার স্বর নীচু হ'ল পারেখের—রীতিমত ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে।

—বল কি হে।

—আজ্ঞে হ্যাঁ। আমার কথা বাজে নয়। প্রথম দিনেই আপনাকে বলেছিলাম, সোজা আঙুলে ঘী উঠ্‌বে না। বোধ হয় আপনি নিজেও কতকটা বুঝেছেন যে আমার কথা একেবারে বেঠিক নয়।

সুপ্রিয় মাথা নাড়ল। বললে—তা হয়ত নয়। কিন্তু একটু বেশী বেশী ভাবছ বোধ হয়। রজ্জুকে সাপ বলে ভুল করছ না তো?

উত্তরে পারেখ বললে—না। বরং তার উল্টো। সাপকে রজ্জু বলে ভুল করেছি আমরা।

—তাহলে সে ভুল শুধ্‌রে নিতে হবে।

—নিশ্চয়ই হবে। কিন্তু আপনি যে মানা করছেন।

মাথা নেড়ে বললে সুপ্রিয়—তা করছি। এখনি শেঠজিকে কিছু জানাবার দরকার নেই।

পারেখ বললে—পুলিশ-অফিসারকে আমি কিন্তু আভাস দিয়ে রেখেছি।

একটু ভেবে সুপ্রিয় বললে—হয়ত ভালই করেছো। কিন্তু আমার বিনা অনুমতিতে তারা যেন ইন্‌টারফিয়ার না করে।

—তা করবে না।

একখানা খাতার উপর চোখ রেখে সুপ্রিয় বললে—খাতাপত্রগুলো একটু সাবধানে রাখতে হবে। ভাউচারের ফাইলগুলোও। এ দায়িত্ব রইল তোমার।

মাথা হেলিয়ে পারেখ বললে—সে-ব্যবস্থা আমি আগেই করেছি।

—বটে! তারিফ্‌ করে বললে সুপ্রিয়—আমার চেয়ে খর-বুদ্ধি তোমার। তাতে সংশয় নেই। ভাল কথা। নতুন নিয়মগুলো জারী হয়েছে। সকলকে জানিয়ে দিও।

পারেখ বললে—জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

—ফল কি লক্ষ্য করেছো?

—ফল জগুয়া।

—অর্থাৎ?

পারেখ উত্তরে বললে—অর্থাৎ, তার দলের লোকদের সে বোঝাতে চেষ্টা করছে যে এ-সব নতুন নিয়ম অত্যাচারের নামান্তর, এদের দ্বারা তাদের অধিকার আর জীবনযাত্রায় হস্তক্ষেপ করা হচ্ছে।

—তাই নাকি ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। এবং এ-ব্যাপারে তাকে যথেষ্ট টাকা আর বুদ্ধির জোগান দেওয়া হচ্ছে।

শূন্য দৃষ্টিতে বাইরের পানে চেয়ে রইল সুপ্রিয়। অনর্থক এ বৈরিতা কেন? সে তো এখানে থাকতে আসে নি। আসেনি কারুর কোন সুখের অন্তরায় হতে। কিন্তু কর্তব্যে ত্রুটি ঘট্‌তে দেবে সে কেমন করে? সেদিক থেকে সে যে নিরুপায়।

* * *

সেইদিন সন্ধ্যায় যোগেশকে দেখা গেল এক নূতন জায়গায়, নূতন পরিবেশের মাঝখানে।

শহরের এক নোংরা বস্তির মধ্যে এক নীচ-জাতীয়া গণিকার ঘরে সে ব'সে আছে। নাচগান চলছিল বোধহয়। থেমেছে। দু'জন সঙ্গী নিয়ে জগুয়া ব'সেছে যোগেশের পাশে। সলা-পরামর্শ চল্‌ছে।

* * *

পরদিন সকাল দশটায় সুপ্রিয় আপিসে গিয়ে বসল। সকলেই যথাসময়ে হাজির হয়েছে, একমাত্র মহিমবাবু ছাড়া।

খাতা-পত্র পারেখের জিম্মায়। মহিমবাবু এলেই কাজ আরম্ভ হবে। কিন্তু তাঁর দেখা নেই। ঘণ্টাখানেক অপেক্ষার পরেও যখন তিনি এলেন না, তখন সুপ্রিয় তাঁকে ডেকে আনবার জন্যে বেহারা পাঠালে।

কিছুক্ষণ পরে বেহারা ফিরে এসে যে-সংবাদ দিলে তা রীতিমত উদ্বেগ-জনক। কাল রাত থেকে মহিমবাবুর ভৃত্য তার মনিবের দেখা পাচ্ছে না। সন্ধ্যার পর একজন অপরিচিত লোক এসে তাঁকে বাড়ির বাইরে ডেকে নিয়ে যায়। তারপর থেকে তাঁর আর কোন সন্ধান নেই। তাঁর চাকরটা চারিদিকে ছুটোছুটি ক'রে বেড়াচ্ছে।

পারেখ দ্রুত বেরিয়ে গেল।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যে পুলিশ এলো।

যোগেশ মন্তব্য করলে—হয়ত জরুরী কোন খবর পেয়ে তিনি দেশে চলে গেছেন।

—তাঁর দেশ কোথায় ?

—সে তো অনেক দূর, শান্তিপুর।

প্রাথমিক তদন্ত শেষ ক'রে পুলিশ অফিসর চলে গেল। যাবার আগে নিভৃতে সুপ্রিয়কে জানিয়ে গেল, সাবধান হবার সময় এসেছে।

সুপ্রিয় কোন কথা বললে না। মনের মধ্যে তার এলোমেলো হাজার চিন্তা। ঘটনার গতি যে সহসা এমন ভয়ঙ্কর বাঁকা পথ ধারণ করবে, তা হয়ত সে অনুমান করতে পারেনি।

যে-যার কাজে চলে গেল। একজন ছোকরা সহকারীকে ডেকে সুপ্রিয় খাতাপত্র পরীক্ষার কাজে নিমগ্ন হল। কাট্‌লো সারাদিন।

* * * * *

পরদিন সকালবেলা যোগেশ সুপ্রিয়র বাংলোয় উপস্থিত হল। সামনেই বসেছিল সুপ্রিয়। কিছু চিন্তামগ্ন। যোগেশকে দেখে বললে—আসুন।

সামনের চেয়ারে বসল যোগেশ। গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে বললে—আমায় ডেকেছেন ?

—হ্যাঁ।

মিনিট খানেক কাট্‌লো নীরবে। তারপর সুপ্রিয় বললে—মহিমবাবু হয়ত দেশেই চলে গেছেন। হয়ত ফিরতে দেরী হবে। না-ও ফিরতে পারেন। কিন্তু কাজ আট্‌কে থাকলে তো চলবে না। হিসেবের ব্যাপারটা তাহলে আমায় আপনার থেকেই বুঝে নিতে হবে। এবং আজই।

যোগেশ বোধ করি প্রস্তুত হ'য়েই এসেছিল। বললে—আমার দ্বারা কি সম্ভব হবে!

—কেন হবে না ? প্রশ্ন করলে সুপ্রিয়।

—খাতা লেখার কাজ তো কখনো করিনি।

যোগেশের মুখের পানে পূর্ণ দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে সুপ্রিয় বললে—কিন্তু টাকাকড়ির লেনদেন হয়েছে আপনার হাত দিয়ে। খাতা আমি দেখেছি। প্রায় চল্লিশ হাজার টাকা আপনার নামে রয়েছে যার হিসেব নেই। অনেক দিন হয়ে গেছে! এতদিনে সে-হিসেবটা মিটিয়ে ফেলেন নি কেন, তা ভেবে আশ্চর্য্য হচ্ছি।

আর কোন উপায় নেই। উদ্ঘাটিত হয়েছে যোগেশের এতদিনের বেপরোয়া অনাচার।

কিন্তু কোন উপায় কোন পথ কি সত্যিই নেই ? ইজ্জত আর প্রতিপত্তি যদি যায় তাহলে তার প্রতিশোধ নিতেও পিছপাও হবে না যোগেশ। কিছুক্ষণ সে স্তব্ধ হয়ে রইল। কি ভাবল মনে মনে।

তারপর শান্তভাবে বললে—আমি মহিমবাবুকে সমস্ত বুঝিয়ে দিয়েছি।

—কিন্তু খাতাপত্র সে-কথা বলছে না।

—আমি নাচার।

—ওটা কোন সন্তোষজনক উত্তর হল না যোগেশবাবু। সুপ্রিয়র কণ্ঠস্বরের পরিবর্ত্তন যোগেশের কান এড়ালো না। ধীরে ধীরে সুপ্রিয় বলতে লাগল—খাতাপত্রে আপনার সই আছে। প্রত্যেক দিনের হিসেবে ঠিক্ দেওয়া আছে। তাছাড়া ডেবিট্ ভাউচারেও আপনার সই আছে। অতএব টাকাটা তো আপনাকেই ফেরৎ দিতে হয়। এবং শুধু তাই নয়, তার জন্যে জবাবদিহিও করতে হয়।

যোগেশ কোন উত্তর করলে না। ঘাড় বেঁকিয়ে স্থির হ'য়ে ব'সে কি ভাবতে লাগল। নরম গলায় সুপ্রিয় বললে—কোম্পানীর কাজ দেখতে এসেছি। সুতরাং আমার অবস্থাটাও আপনাকে বুঝতে হবে। দেখে শুনে চুপ ক'রে থাকা তো সম্ভব নয়।

চোখ তুলে একটু ঝুঁকে যোগেশ বললে—চুপ ক'রে থাকা কি একেবারেই অসম্ভব ?

সুপ্রিয়র ওষ্ঠপ্রান্তে ক্ষীণহাসি দেখা দিল। বললে—নিরর্থক প্রশ্নের জবাব না দেওয়াই ভাল।

শেষ চেষ্টা করলে যোগেশ। নীচু গলায় অনুনয়ের সুরে বললে—আপনিও বাঙালী, আমিও বাঙালী। আমার মানইজ্জত গেলে আপনার কোন লাভ হবে না। তার চেয়ে রফা করা যাক না কেন ?

দশ হাজার টাকা আপনাকে দেব। দয়া ক'রে মিটিয়ে নিন ব্যাপারটা। ইচ্ছে করলে, খুব সহজেই পারবেন।

উলঙ্গ হ'য়ে দেখা দিয়েছে যোগেশ। দুঃখ বোধ করল সুপ্রিয়। সেই সঙ্গে হাসিও পেল। মাথা নেড়ে বললে—টাকার প্রলোভন এড়ানো সহজ নয়। কিন্তু এক্ষেত্রে নিতান্ত অপাত্রে আপনার বক্তব্য পেশ করেছেন। একদিন সময় দিলাম। পরশু হেড আপিসে রিপোর্ট পাঠাবো। তার আগেই টাকাটা আপনাকে দিতে হবে। এবং সেই সঙ্গে পদত্যাগ-পত্র।

মাথার খুলির উপর সহসা কে যেন সজোরে হাতুড়ির ঘা মারলে, দুই কানের মধ্যে ঝিমঝিম শব্দ। কিন্তু দমবার পাত্র নয় যোগেশ। উদ্দামকণ্ঠে ব'লে উঠল—দুটোই অসম্ভব।

উঠে দাঁড়াল সুপ্রিয়। শান্তভাবে বললে—পরশু সকালে আপনার সঙ্গে দেখা হবে। এখন আর কথা বাড়িয়ে লাভ নেই।

সঙ্গে সঙ্গে যোগেশও উঠে দাঁড়াল। কথার সুর পালটে ফেলে বললে—আচ্ছা, তাহলে চললাম। একটা কথা বলবার ছিল।

—বলুন।

—মিস চক্রবর্ত্তী, মানে প্রমীলা, তার পিসিমা আপনাকে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে বলেছেন।

অবাক হল সুপ্রিয়।

—তাঁর সঙ্গে তো আমার জানাশোনা নেই। তিনি হঠাৎ...... আচ্ছা, যাব, সুবিধামত।

যোগেশ চলে গেল। সুপ্রিয় চিঠি লিখতে বসল।

মিনিট পনেরো পরে দরজার কাছে মানুষের সাড়া পাওয়া গেল। মুখ তুলে সুপ্রিয় দেখলে, জগুয়া এসে দাঁড়িয়েছে। এক মিনিট সুপ্রিয় তাঁকে লক্ষ্য করে নিলে। উদ্ধত তার ভঙ্গী। কঠিন তার মুখের ভাব।

—আমাকে তলব করেছেন ?

—হ্যাঁ, ভিতরে এসো।

এদিক ওদিক তাকিয়ে জগুয়া ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়াল। কলমটা যথাস্থানে রেখে চেয়ারে হেলান দিয়ে সুপ্রিয় বললে—জগুয়া, কাজ করে দিন গুজরান করতে হলে যেখানে কাজ করতে হবে সেখানকার নিয়ম-কানুনগুলো মেনে চলাই দরকার। তা না করলে কর্তারা অসন্তুষ্ট হবে আর তাহলে তো জীবনে উন্নতি করা যাবে না।

জগুয়া চুপ করে রইল।

সুপ্রিয় বললে—কয়েকটা নতুন নিয়ম জারী করা হয়েছে। শুনলাম, তুমি তা মানো নি। এ-কথা সত্যি কিনা তা তোমার মুখ থেকে শুনতে চাই।

ক্ষণকাল নীরব থেকে জগুয়া বললে—আপনার নয়া নিয়মগুলো আমাদের লোকসান করবে। আপনি আমাদের আমোদ-আহ্লাদ বন্ধ করে দিতে চান। বেশী করে খাটাতে চান। তা ছাড়া আমাদের অনেকের ছাঁটাই হবে শুনছি। এ-সব বরদাস্ত হচ্ছে না আমাদের।

সুস্পষ্ট বিদ্রোহ ঘোষণার আভাস।

—এসব নিয়ম বন্ধ করতে হবে আপনাকে।

—বল কি তুমি ! অসহ্য বিস্ময়ে সুপ্রিয় সোজা হ'য়ে বসল। মনের ক্রোধ দমন করে বললে—আচ্ছা, তুমি এখন যেতে পারো।

বীরদর্পে জগুয়া বেরিয়ে গেল।

রামলাল আসছিল ডাক নিয়ে। পথে নেমে তাকে সামনে দেখে জগুয়া হঠাৎ ক্রুদ্ধ হুঙ্কার দিয়ে উঠ্‌ল—এই যে বুড়ো বেইমান……

একেই রামলালের প্রতি জগুয়ার ঈর্ষার অন্ত ছিল না, তার উপর সম্প্রতি সে জেনেছে যে, তারা যে দল পাকিয়ে নূতন সুপারিন্‌টেনডেণ্টের বিরুদ্ধাচরণ করবার মতলব করেছে তাতে রামলালের সায় নেই। সময় পেলেই রামলাল সবাইকে বুঝিয়ে বেড়াচ্ছে যে নূতন সাহেব খুব ভাল লোক, অসৎ লোকের প্ররোচনায় তাঁর বিরুদ্ধে গেলে তাদের সবাইকার স্বার্থহানি ঘটবে। এইসব কথা জেনে রামলালের প্রতি জগুয়ার মনে তীব্র আক্রোশ জমা হয়েছিল। তাই এখন তাকে সামনা সামনি দেখে সে বারুদের মতো জ্বলে উঠ্‌ল।

—বেইমান কুত্তা কাঁহাকা ! সাহেবের পা চাট্‌তে যাচ্ছিস্‌ ?

জগুয়ার মনের খবর রামলালের অজ্ঞাত ছিল না। হেসে বললে—তাঁর পা চাটাতেও পুণ্য আছেরে জগুয়া।

—হারামি ! কুত্তা ! বেইমান !

—বারে বারে গাল দিচ্ছিস কেন ? বুড়ো গর্জ্জে উঠ্‌ল।

—আলবৎ দেগা ! বলে জগুয়া তার দিকে ধেয়ে গেল এবং পুনরায় কুৎসিত ভাষায় তাকে গালাগাল দিলে।

—খবরদার জগুয়া ! ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে লাগল রামলাল।

জগুয়ার মাথায় তখন যেন খুন চেপেছে। হিতাহিত জ্ঞান লুপ্ত

হয়েছে। হঠাৎ রামলালের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বললে—তোমরা জান হাম পহেলা লেঙ্গে!

আকস্মিক আঘাতে বৃদ্ধ রামলাল মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। আর জগুয়া তার বুকে পেটে লাথি মারতে লাগল।

বাংলোর অনতিদূরেই এই শোচনীয় কাণ্ড ঘটছিল। গোলমাল শুনে সুপ্রিয় বেরিয়ে এসেছিল। রামলাল মাটিতে পড়ে যেতেই সে ছুটে পথের উপর নেমে এল।

—এই উল্লু!

সুপ্রিয়র চীৎকার শুনে জগুয়া ঘুরে দাঁড়াল। তার দুই চোখে তীব্র অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ।

এগিয়ে গিয়ে জগুয়ার বুকের জামাটা চেপে ধরলে সুপ্রিয়। ক্রোধে তার সর্ব্ব শরীর কঠিন আকার ধারণ করেছে। কঠোর কণ্ঠে বললে—কেন মারলি বুড়োকে?

—আমার খুসী!

—খুসী! সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড বজ্রমুষ্টি পড়ল জগুয়ার মুখের উপর। এক আঘাতেই ঠিক্‌রে পড়ল সে।

—খুসী! হারামজাদ!

জগুয়া উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করছিল। আবার পড়ল ঘুসি। আবার ছিটকে পড়ল। আবার উঠ্‌ল। আবার পড়ল। দু'চোখে অন্ধকার দেখতে লাগল জগুয়া। সুপ্রিয়র সে-রকম ভীষণ মূর্ত্তি জীবনে কেউ কখনো দেখেনি।

এদিকে রামলাল উঠে বসেছে মাটির উপর। প্রহারের বেদনা

ভুলে গিয়ে তার দুই চোখে আনন্দের দীপ্তি বিচ্ছুরিত হচ্ছে। সুপ্রিয়র এক-একটা ঘুসিতে ভূলুণ্ঠিত হচ্ছে জগুয়া আর অস্ফুটে রামলাল বলছে—সাবাস!

আঘাতে আঘাতে জর্জ্জরিত হ'য়ে কোন রকমে জগুয়া সে-স্থান পরিত্যাগ করলে। অদূরে দাঁড়িয়ে কয়েকজন ছোকরা-শ্রমিক তার লাঞ্ছনা দেখে হাসছিল, তাদের পানে ক্রূর হিংস্র দৃষ্টি হেনে জগুয়া বলে গেল—দেখে নেব।

ফিরে দাঁড়াল সুপ্রিয়। রামলালের কাছে গিয়ে তাকে তুলে দাঁড় করিয়ে দিয়ে বললে—বড্ড লেগেছে কি রামলাল?

রামলাল কথা বলতে পারল না। ধীরে ধীরে আবার ব'সে পড়ল। সুপ্রিয়র দু'হাতের স্পর্শ পেয়ে সে যেন কেমন অবশ নিস্পন্দ হ'য়ে গেল।

* * * * *

শোভা এলো প্রমীলার কাছে।

তার দু'হাত ধ'রে প্রমীলা তাকে ঘরে এনে বসালো। বললে—তোদের কারুরই যে আর দেখা নেই। ব্যাপার কি? সবাই মিলে আমায় ত্যাগ করলি নাকি?

শোভা জবাব দিলে—সবাইকার কথা জানিনে দিদি। আমার নিজের কথাই শুধু বলতে পারি।

—তাই বল্ তাহলে। কিন্তু অমন বিষণ্ণ দেখাচ্ছে কেন? কারুর সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে?

মাথা নেড়ে শোভা বললে—হয়েছে। তবে আমার সঙ্গে নয়। দাদার আপিসে। সুপ্রিয়বাবুর সঙ্গে যোগেশদা'র।

—সে আবার কি ? উৎকর্ণ হল প্রমীলা।

—হ্যাঁ, তাই।

—কি খবর বল্ দেখি স্পষ্ট ক'রে ?

শোভা বলতে লাগল—খবর ভাল নয়। দাদার মুখে আজ সব শুনছিলাম। তাঁদের আপিসে খুব ডামাডোল। কি সব হিসেবের গোলমাল ধরা পড়েছে। যোগেশদাই নাকি সে-সবের জন্যে দায়ী। এই ব্যাপারে যোগেশদা' ক্ষেপে উঠেছেন আর তাঁর সঙ্গে জুটেছে গুণ্ডার সর্দ্দার জগুয়া। তারা সুপ্রিয়বাবুকে অপদস্থ করবার জন্যে ভীষণ ষড়যন্ত্র করছে। এমন কি, দাদা বললেন যে, তারা তাঁকে মারতেও পিছুপা হবে না। দাদা বলছিলেন, অতি সাংঘাতিক পাষণ্ড এই জগুয়া। সে দশটাকার জন্যে মানুষ খুন করতে পারে।

কম্পিতকণ্ঠে প্রমীলা বললে—বলিস কিরে! এত কাণ্ড। কিছুই তো জানিনে।

—তুমি আর জানবে কি ক'রে! শোভা বলতে লাগল—আরও ভয়ের খবর আছে। পরশু রবিবার জগুয়ার দল মিটিং করবে। যোগেশদাই এই মিটিং-এর ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। সেই সভায় তিনি প্রকাশ্যেই সুপ্রিয়বাবুর বিরুদ্ধে বলবেন যে সুপ্রিয়বাবু নাকি শ্রমিকদের সর্ব্বনাশ করবার জন্যেই এসেছেন। জগুয়ার দল সেই সভায় সুপ্রিয়-বাবুকে এখান থেকে চলে যেতে বলবে। দাদা বলছিলেন, মিটিং-এ খুব গোলমাল হবে। সুপ্রিয়বাবু যদি সেই সভায় যান তাহলে তাঁর ভীষণ বিপদ ঘটবে, এমন কি প্রাণ নিয়েও টানাটানি হ'তে পারে।

—সে কি! কেঁপে শিউরে উঠ্ল প্রমীলা।

—হ্যাঁ দিদি। দাদা খুব ভয় পেয়েছেন। সুপ্রিয়বাবু নাকি বলেছেন, তিনি কাউকে ভয় করবেন না, সভায় যাবেন, সবাইকে বুঝিয়ে বলবেন। কিন্তু দাদা বলেছেন যে তাঁর কথা কেউ শুনবে না, সভায় তাঁকে দেখলে গুণ্ডার দল আরও উত্তেজিত হয়ে একেবারে ক্ষেপে উঠবে···

—শোভা। ব্যাকুল কণ্ঠ প্রমীলার।

তার ব্যাকুলতা দেখে শোভা ঈষৎ বিস্মিত হল। বললে—বল।

—তাঁকে সভায় যেতে নিষেধ ক'রে দেওয়া হোক না কেন?

—কাকে? সুপ্রিয়বাবুকে? শোভা বললে—কিন্তু কার মানা তিনি শুনবেন? দাদার মুখে এইসব কথা শুনে মনটা বড় খারাপ হ'য়ে আছে প্রমীলাদি'। কোন উপায় কি করা যায় না?

বিহ্বলের মত প্রমীলা বললে—উপায়? কিসের উপায়?

—সুপ্রিয়বাবু যাতে সভায় না যান তার উপায়?

প্রমীলা নিষ্পলকনেত্রে শুধু তাকিয়ে রইল। কথা বুঝি খুঁজে পাচ্ছে না সে। হঠাৎ কি ভেবে শোভা বললে—আচ্ছা, তুমি বারণ করতে পারো না? তোমার সঙ্গে তো আলাপ হয়েছে। হয়ত তোমার কথা তিনি শুনবেন।

অস্ফুট কণ্ঠে প্রমীলা বললে—আমার কথা। শুনবেন কি?

শোভা জোর দিয়ে বললে—নিশ্চয় শুনবেন। আমার মন বলছে তোমার মানা ব্যর্থ হবে না। আজ সন্ধ্যে হ'য়ে গেছে। আজ আর দরকার নেই। কাল সকালেই তুমি তাঁর সঙ্গে দেখা কোরো। তাতে কোন লজ্জা নেই। একটা মানুষের প্রাণের মূল্য কম নয় দিদি।

অন্যমনে প্রমীলা বললে—আমি যাব তাঁর কাছে? গিয়ে বলব?

—হ্যাঁ, বলবে। তাতে কোন দোষ নেই, কোন অপরাধ নেই। এ-কাজ যদি করতে পারো তাহলে অক্ষয় পুণ্য হবে তোমার।

শোভা তো জানে না, কাকে কি বলছে। কী ঝড় যে উঠেছে প্রমীলার মনের আকাশে তার খবর শোভা পাবে কেমন করে? আরও খানিকক্ষণ প্রমীলার কাছে অতিবাহিত ক'রে সে চলে গেল।

*   *   *   *

বাইরে এসে দাঁড়াল প্রমীলা। আধো-অন্ধকারাচ্ছন্ন বারান্দাটা যেন গিলতে আসছে। চারিদিক যেন দুলছে। আকাশে কি আজ তারা নেই? চোখের দৃষ্টি সহসা ক্ষীণ হয়ে গেল নাকি?

বারান্দার অপর প্রান্তে জুতোর শব্দ। আলোর নীচে এসে দাঁড়িয়েছে ও কে? ভীষণ চমকে উঠ্‌ল প্রমীলা। সুপ্রিয় এসেছে।

তাকে দেখে সুপ্রিয় এগিয়ে এলো। বললে—এই যে, তুমি রয়েছো এখানে। যোগেশবাবুর কাছে শুনলাম, তোমার পিসিমা আমায় নাকি ডেকে পাঠিয়েছেন। কেন বল তো?

সুপ্রিয়কে দেখে প্রমীলার বিহ্বলতা যেন আরও বেড়ে গেল। তার কথা শুনে বিস্ময়ের অন্ত রইল না তার। পিসিমা ডেকেছেন সুপ্রিয়কে! সে তো কিছুই জানে না।

মৃদুকণ্ঠে প্রমীলা উত্তর দিলে—তা তো জানিনে।

—জানো না? আচ্ছা, তাহলে এক কাজ কর। তোমার পিসিমাকে গিয়ে বলো, আমি দেখা করতে এসেছি।

কি যেন বলতে গেল প্রমীলা। বলা হ'ল না। সুপ্রিয় বললে—

আমার একটু তাড়া আছে কিন্তু। অনেক কাজ ফেলে রেখে এসেছি।

মৃদু আলোর নীচে মুহূর্তের জন্যে চোখোচোখি হল। তারপর ক্ষীণস্বরে প্রমীলা বললে—আমি জিগেস করে আসি।

ভিতরে চলে গেল প্রমীলা। স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সুপ্রিয়। প্রমীলার ক্লিষ্ট ক্লান্ত দুই নয়নের অন্তরালে কী সে ভাষা প্রকাশের পথ খুঁজছিল? দোলা লাগল সুপ্রিয়র মনে।

প্রমীলা উপরে উঠল। পিসিমা চোখে চশমা লাগিয়ে বই পড়ছিলেন। ঘরে ঢুকে প্রমীলা বললে—পিসিমা!

—কিরে?

—তুমি কি সুপ্রিয়বাবুকে আসতে বলেছিলে?

পিসিমা সোজা হ'য়ে বসলেন। প্রশ্ন করলেন—এসেছে নাকি?

—এসেছেন। নীচে অপেক্ষা করছেন।

পিসিমা বললেন—ওপরে নিয়ে আয়।

—কেন ডেকেছো পিসিমা?

—কেন? পিসিমা হাসলেন—দাদার সঙ্গে ওদের কত আলাপ ছিল। তাই সে যখন এখানে এসেছে তখন দেখা ক'রে খবরাখবর নেওয়া দরকার বৈকি। যা, ডেকে নিয়ে আয়।

শ্লথপদে নীচে নামল প্রমীলা। পিছন ফিরে দাঁড়িয়েছিল সুপ্রিয়। টের পেল না। কাছে গিয়ে প্রমীলা বললে—পিসিমা ডাকছেন।

—অ্যাঁ। হ্যাঁ, চল, যাই।

সুপ্রিয়কে নিয়ে প্রমীলা উপরে উঠল। তাকে দেখে পিসিমা

অভ্যর্থনা করলেন—এসো বাবা, এসো। বোসো, এই চেয়ারটায় বোসো। প্রমীলা, তুমি নীচে যাও।

এক মুহূর্ত কি ভাবলে প্রমীলা। বোধ হয় দ্বিধা করলে। তারপর ধীরে ধীরে নীচে নেমে গেল।

চশমার আড়াল থেকে এক ঝলক দৃষ্টি হেনে পিসিমা বললেন—তুমিই প্রিয় মুখুজ্যের ছেলে সুপ্রিয় ?

ঘাড় নেড়ে সুপ্রিয় জবাব দিলে—আজ্ঞে হ্যাঁ। কাকাবাবুর সঙ্গে অনেকদিনের পরিচয় ছিল। আপনার সঙ্গে এর আগে দেখা হয়নি। আজ আপনার কাছে এসে আনন্দ বোধ করছি।

—দেশ ছেড়ে তো পালিয়েছিলে। আবার যে এখানে এসে জুটবে তা ভাবিনি।

পিসিমার কথাগুলো সুপ্রিয়কে যেন সজোরে ধাক্কা দিল। সে নীরবে তাকিয়ে রইল। পিসিমার বাক্যস্রোত প্রবাহিত হল—লজ্জা-সরমের বালাই যে তোমার থাকবে না তা জানতাম। কিন্তু আবার যে কোন ছুতোয় আমাদের বাড়ীতে ঢোকবার চেষ্টা করবে তা অনুমান করতে পারিনি।

সুপ্রিয় আড়ষ্ট বিমূঢ়। ডেকে এনে হঠাৎ এ কী সম্বর্দ্ধনা!

পিসিমার জিভ্ চলতে লাগল—বাপবেটায় মিলে আমাদের সর্ব্বনাশ ক'রেও আশ মেটেনি? আবার এসেছো জ্বালাতে? কিন্তু এবার আর সুবিধে হবে না। ফের যদি কখনো আমার বাড়ীতে আসো বা আমার মেয়ের সঙ্গে আলাপ করবার চেষ্টা কর তাহলে পুলিসে দেব তোমায়।

বিহ্বলের মতো সুপ্রিয় বললে—এসব কি বলছেন আপনি! এই সব বলবার জন্যেই কি ডেকেছিলেন?

মাথা নেড়ে তীব্র বিষাক্ত হাসি হেসে পিসিমা বললেন—ও, তুমি বুঝি ভেবেছিলে, জামাই-আদর করবার জন্যে তোমায় ডেকেছিলাম! পাষণ্ড, সয়তান কোথাকার! হবে না? যেমন বাপ তেমনি বেটা! বংশটা কি রকম দেখতে হবে তো! চার পুরুষে সবাই মোদো-মাতাল লম্পট আর জোচ্চোর! বাপের তাড়া খেয়ে যে-ছেলে দেশ ছেড়ে পালায় সে কি পুরুষ-মানুষ? আর বাপই বা কেমন? জুয়ো খেলে ভিটে-মাটি চাটি ক'রে শেষে আগুনে পুড়ে আত্মহত্যা ক'রে বাঁচলো। এই তো তোমাদের পরিচয়, এই তো তোমাদের কীর্তি-কলাপ। আমার ভাইকে তোমরা দু'জনে মিলে মেরে ফেলেছো, তা জানো! অন্য রাজত্ব হলে তোমাদের মাটিতে পুঁতে কুকুর দিয়ে খাওয়ানো হোত।

দম নিয়ে পিসিমা আবার শুরু করলেন—যাক। শোন। যোগেশের সঙ্গে আমার মেয়ের বিয়ে ঠিক হোয়ে গেছে। খুব ভাল ছেলে যোগেশ। তুমি তার পায়ের নখের যুগ্যিও নও। আসছে মাসে বিয়ে। সুতরাং তুমি আর তোমার কালামুখ নিয়ে আমার বাড়ীর আনাচে কানাচে ঘুরো না। কোন ফল হবে না। বুঝেছো?

সুপ্রিয় আর নিজেকে অস্থির-বিপর্যস্ত মনে করছে না। মাথা নেড়ে বললে—বুঝেছি। বলুন, আর কি বলবেন।

—আর কিছু বলার নেই।

—তাহলে কি যেতে পারি?

পিসিমা বললেন—যাবে না তো কি, এখানে বসে থাকবে ?

সুপ্রিয় উঠে দাঁড়াল। অন্ধকারে সিঁড়িটা ঠাহর করতে পারছিল না। হাতড়ে হাতড়ে নেমে এলো।

বারান্দার প্রান্তে দাঁড়িয়েছিল প্রমীলা। কি বলবে, মনে মনে তারই জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিল। সুপ্রিয়কে দেখে কাছে এসে দাঁড়াল। একেবারে একান্ত সন্নিকটে।

—কি বললেন পিসিমা ? ব্যগ্রকণ্ঠ প্রমীলার।

সুপ্রিয় হাসল। বিকৃত করুণ হাসি। বললে—সে অনেক কথা। পেট ভ'রে গেছে। কথায় আছে, যে-কাঠায় মাপ সেই কাঠায় শোধ। কালিনাথের কাছে তোমরা যা শুনেছিলে তার চতুর্গুণ আজ ফিরে পেলাম। পাওনা ছিল। তাই দুঃখ নেই।

অন্তরে অন্তরে শিউরে উঠ্‌ল প্রমীলা। বাড়ীতে ডেকে এনে পিসিমা যে তাঁকে দারুণ অপমান করেছেন তাতে আর সংশয় নেই। কিন্তু তার নিজের কথা যে এখনো বলা হয় নি! সুপ্রিয় যে চলে যাচ্ছে! ব্যাকুল হল প্রমীলা। এগিয়ে গিয়ে বললে—কথা ছিল যে!

ফিরে দাঁড়াল সুপ্রিয়। ক্লান্তকণ্ঠে বললে—পিসিমার বাকি কথা তুমি বুঝি শেষ করবে ? বেশ, বল, শুনি।

সঙ্কোচ দূর কর প্রমীলা। মনে সাহস আনো। সময় বেশী নেই। কিন্তু কথা বলতে আটকাচ্ছে যে! গলা কাঁপছে কেন ? ক্ষণকাল নীরব থেকে প্রমীলা বললে—আপিসের কাজে নাকি খুব গোলমাল ? অনেকে নাকি বিরুদ্ধে লেগেছে ?

সুপ্রিয় কৌতূহলী হল। কৌতুক বোধ করলে। হেসে বললে—খোঁজখবর রাখছো তাহলে ?

এক নিঃশ্বাসে প্রমীলা বললে—এসব গোলমালের মধ্যে না থাকাই তো ভাল, বিশেষ ক'রে পরশুর মিটিংএ না যাওয়াই দরকার। শুনছি, বিশ্রী কাণ্ড হবে।

এই কি তোমার নিষেধের ভাষা প্রমীলা, এই ক্ষীণ দুর্ব্বল বাক্যবিন্যাস ? এখনো স্পষ্ট কণ্ঠে জোর দিয়ে দাবী জানিয়ে বলতে পারছো না, সেই হট্টগোলের সভায় তুমি যেতে পাবে না কোনমতেই। জোর কি হারিয়ে ফেলেছো একেবারেই ?

সুপ্রিয় বললে—হ্যাঁ, শুনছি খুব গোলমাল হবে। সেই জন্যে তো আরও বেশী ক'রে যেতে হবে আমায়।

—কী দরকার যাবার ? যদি গুরুতর কোন ব্যাপার ঘটে! বিপদের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়ানো কেন ?

সুপ্রিয় এবার হেসে উঠ্ল। বললে—ভয় নেই। তুমি বোধ হয় যোগেশবাবুর জন্যে উদ্বিগ্ন হয়েছো। কিন্তু তিনি দলবল নিয়ে উপস্থিত থাকবেন। আমি যাব একা। সুতরাং তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারো, তাঁর কোন বিপদ ঘট্‌বে না।

পাহাড়ের চূড়া থেকে কঠিন মাঠিতে পড়ল প্রমীলা চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে। কি একটা কথা তার মুখ দিয়ে নির্গত হল। বোঝা গেল না। ঠোঁট দুটি কাঁপতে লাগল। পাংশু মুখের উপর যেন মৃত্যুর ছায়া।

সুপ্রিয় বললে—আচ্ছা, চললাম।

চলে যেতে দিলে প্রমীলা? পথ আটকাতে পারলেনা? বলতে পারলে না কিছুই শেষ পর্যন্ত? এ কী করলে তুমি?

* * * *

রবিবার অপরাহ্ন।

মাঠের দিক থেকে ক্রমবর্দ্ধমান কোলাহল ভেসে আসছে। দলে দলে শ্রমিকরা সভায় চলেছে। তাদের হাতে দলীয় পতাকা। কণ্ঠে বিক্ষোভের বাণী, নয়া সুপারিন্‌টেনডেণ্ট মুর্দ্দাবাদ, মজদুর ইউনিয়ন জিন্দাবাদ, জুলুমবাজী চলবে না। ইত্যাদি।

প্রমীলা বাইরের বারান্দায় এসে দাঁড়াল। সারা দিন যে তার কেমন ক'রে কেটেছে তা জানেন অন্তর্য্যামী। স্নায়ুতন্ত্রীর মধ্যে দুঃসহ আবেগ। শিরায় শিরায় যে কাঁপন জেগেছে তা যেন আর থামতে চাইছে না। এক দিনে সে যেন একশো দিনের রোগ ভোগ ক'রে জীর্ণ হ'য়ে পড়েছে।

না ঘরে, না বাইরে, কোথাও স্বস্তি পাচ্ছে না। বারান্দা থেকে ঘরের মধ্যে গিয়ে বসল। কিন্তু সেখানেও যেন চারিদিকে কোলাহল। ক্ষণে ক্ষণে অন্যমনস্ক হচ্ছে। কান পেতে শুনছে, কে যেন তাকে ডাকছে! চমকে উঠ্‌ছে বার বার।

কানের কাছে বাজছে সেই বিদায়-বাণী—'যাবে না আমার সঙ্গে? একদিন যে-গান গেয়ে শুনিয়েছিলে, 'পাড়ি দিতে নদী, হাল ভাঙে যদি ছিন্ন পালের কাছি, মৃত্যুর মুখে দাঁড়ায়ে জানিব, তুমি আছ আমি আছি,'—সে কি তবে মিথ্যে?'

সত্যিই কি তা মিথ্যা হল প্রমীলার জীবনে? এতবড় বিড়ম্বনাও শেষ পর্য্যন্ত সইতে হল তাকে......

—কে? চমকে দাঁড়িয়ে উঠ্‌ল প্রমীলা। না, কেউ তো নয়। বাতাসে দরজাটা ন'ড়ে উঠ্‌ল।

—মাঈজি।

—কে রে?

—আমি হরিয়া।

রামলালের অনুগত অনুচর। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে হাঁপাচ্ছে। মুখে-চোখে নিদারুণ আতঙ্কের ছায়া।

ত্রস্তপদে এগিয়ে এলো প্রমীলা। কম্পিতকণ্ঠে প্রশ্ন করলে—কি হয়েছে হরিয়া?

—মা, সর্ব্বনাশ! সর্ব্বনাশ হবে এখনি। সর্দ্দার আমায় আপনার কাছে পাঠালে।

—কি হয়েছে? রামলাল কোথায়?

হরিয়া বললে—সর্দ্দার বাড়ীতে শুয়ে আছে। আজ দু'দিন সে উঠ্‌তে পারছে না। খুব জ্বর আর গায়ে বুকে বড্ড বেদনা। সেদিন গুণ্ডারা তাকে বড্ড মেরেছে।

—সে কি?

—হ্যাঁ মা। বড্ড লেগেছে সর্দ্দারের। কিন্তু সে-কথা নয়। আপনাকে মিটিংএ নিয়ে যাবার জন্যে সর্দ্দার আমায় পাঠিয়েছে। মুখার্জ্জি সাহেবের আজ বড় বিপদ। আপনি গিয়ে তাঁকে

মিটিং থেকে ফিরিয়ে আনুন। জগুয়া আজ তাঁকে খুন করবে বলেছে।

প্রমীলার কণ্ঠ দিয়ে অস্ফুট আর্ত্তধ্বনি নির্গত হল। হরিয়া বলতে লাগল—সর্দ্দার বলেছে, সাহেব তোমার কথা শুনবেন। তুমিই তাঁকে বাঁচাতে পারবে। তুমি শিগগির এসো মা, মিটিং শুরু হবে এখুনি। আর সময় নেই। সাহেব কারুর কথা শুনবেন না, মিটিংএ যাবেন। হয়ত এতক্ষণ রওনা হয়েছেন। সর্ব্বনাশ হবে মা, সর্ব্বনাশ হবে। সর্দ্দার বলেছে, যেমন করে হোক আপনাকে যেতে হবে তাঁর কাছে।

রামলাল বলেছে এই কথা? রামলালের মুখ দিয়ে ভগবান কি তাঁর শেষ নির্দ্দেশ পাঠালেন প্রমীলাকে?

—তুমি যাবে না মা?

—যাব।

হরিয়া ব্যস্ত হল—তাহলে আমি সর্দ্দারকে বলি গে?

—হ্যাঁ, যাও। আমি যাচ্ছি। একাই যেতে পারবো।

ছুটে চলে গেল হরিয়া। অদূরে চীৎকার আর গণ্ডগোল বাড়ছে।

প্রবল ভূমিকম্পে চারিদিক যেন ধ্বসে পড়েছে। সেই ভগ্নস্তূপের ভিতর দিয়ে পথ খুঁজে নিতে হবে প্রমীলাকে। আঁচলটা কোমরে জড়িয়ে সে বারান্দা থেকে নামল। থমকে দাঁড়াল বারেক। দু' হাত তুলে প্রণাম করলে পথের দেবতাকে। শক্তি দাও, শক্তি দাও ভগবান, এই পথটুকু পার হতে প্রমীলাকে শক্তি দাও।

*   *   *   *

সভায় উত্তেজনা আর হট্টগোলের অবধি নেই। মঞ্চের উপর দাঁড়িয়ে হাতপা ছুঁড়ে চীৎকার করে যোগেশ বক্তৃতা দিচ্ছে। সে-বক্তৃতা যেমন উত্তেজক তেমনি হিংসা-পঙ্কিল।

—শ্রমিকদের সর্ব্বনাশ করবার জন্যে বোম্বাই থেকে যারা এসেছে তাদের জুলুমবাজী আর অত্যাচার শ্রমিকরা কি নতমস্তকে মেনে নেবে?

'না', 'না,' শব্দ উঠল চারিদিক থেকে। মুর্দ্দাবাদ আর জিন্দাবাদ ধ্বনিতে সভাস্থল মুখর হল।

যোগেশ বলতে লাগল—সর্ব্ব রকমে শ্রমিকদের শুষে নিতে, তাদের জীবনের আনন্দকে হরণ করতে যারা এসেছে তারা ফিরে যাক। নইলে······

কথা অসমাপ্ত রইল। ক্রুর হিংস্র দৃষ্টিতে যোগেশ তাকাল সুপ্রিয়র দিকে। মঞ্চের একধারে একখানা হাতল-ভাঙ্গা চেয়ারের উপর ব'সে আছে সুপ্রিয়, স্থির নিষ্কম্প।

মঞ্চের সামনে জমাট ভিড়ের পিছনে দাঁড়িয়েছিল জগুয়া। ধীরে ধীরে ভিড় ঠেলে সে মঞ্চের দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। তার ডানহাতখানা রয়েছে কোমরে যেখানে লুকানো আছে বিষাক্ত শানিত ছুরিকা। সুপ্রিয়র হাতে ঘুসির চোট খাওয়া কালসিটা-পড়া তার হিংস্র মুখখানা বীভৎস দেখাচ্ছে। নেশাগ্রস্ত রক্তাক্ত দুই চোখের জ্বলন্ত দৃষ্টি সুপ্রিয়র প্রতি নিবদ্ধ, ঠোঁটের অগ্রভাগে পৈশাচিক হাসির রেখা।

আবার চীৎকার উঠল—জুলুমবাজী চলবে না। নয়া সাহেব লোক মুর্দ্দাবাদ।

বক্তৃতা শেষ করে সুপ্রিয়র দিকে ফিরে উদ্ধত বিজয়ীর মত ভঙ্গীতে যোগেশ বললে—বলুন এবার কি বলবেন।

অকস্মাৎ চারিদিক নিস্তব্ধ হয়ে গেল। মৃদু গুঞ্জন উঠল। ভীড়ের পাশ দিয়ে ও কে এগিয়ে আসছে? প্রমীলা? হ্যাঁ প্রমীলাই তো!

মঞ্চের উপর উঠে এলো প্রমীলা। সুপ্রিয়র সামনে গিয়ে দাঁড়াল। রুদ্ধশ্বাসে বললে—চলে এসো এখান থেকে। এসো।

জীবনের সবচেয়ে বড় বিস্ময় সুপ্রিয়কে বিহ্বল করলে ক্ষণকালের জন্যে। বললে—তুমি! তুমি এখানে কেন?

উঠে দাঁড়াল সুপ্রিয়। এ কী অপ্রত্যাশিত ঘটনা!

প্রমীলা বললে—আসতেই হ'ল আমায়। এ-সভায় তোমার আর এক মুহূর্ত্ত থাকা চলবে না। চলে এসো।

—কি বলছ তুমি? যাও, যোগেশবাবুর পাশে গিয়ে বোসো গে।

আজ আর কথার আঘাতে দুমড়ে পড়ল না প্রমীলা। আজ আর নিজের কথা হারিয়ে যাচ্ছে না। বললে—তিরস্কার করবার অনেক সময় পাবে পরে। এখন চল এখান থেকে।

—অনর্থক তুমি এসেছো। দৃঢ়কণ্ঠে সুপ্রিয় বললে—আমি যাব না। তুমি ফিরে যাও।

বাঁধ ভেঙেছে। বুকের মাঝখানে যে আগল পড়েছিল তা উন্মুক্ত হয়েছে। প্রমীলা বললে—অন্তবিহীন পথ পার হয়ে যখন তোমার কাছে পৌঁছতে পেরেছি তখন কি শুধু হাতে ফিরবো? এসো তুমি।

আরও কাছে গিয়ে দাঁড়ালো প্রমীলা। ঘাড় নেড়ে সুপ্রিয় বললে—না, আমার কথা না বলে আমি যাব না।

এই বলে সে এগিয়ে গেল মঞ্চের সামনে। প্রমীলার গতিও আজ আর রুদ্ধ হবার নয়। সঙ্গে সঙ্গে সে-ও গিয়ে তার পাশে দাঁড়ালো।

সেই অভিনব দৃশ্যের সামনে হতভম্ব হয়ে গেছে যোগেশ। শ্রমিকরা অবাক-নেত্রে চেয়ে আছে। কারুর মুখে কোন কথা নেই। সভাস্থলে সূচীভেদ্য স্তব্ধতা।

সুপ্রিয় বলতে লাগল—ভাই সব। তোমরা মনে কোরো না, ভয় পেয়ে আমি তোমাদের মন-রাখা কথা বলবার জন্যে উঠে দাঁড়িয়েছি। আমি বলতে এসেছি যে তোমরা ভুল পথে চলেছো, স্বার্থলোভী কুচক্রীদের ষড়যন্ত্রের কবলে পড়ে তোমরা হিতাহিত জ্ঞান হারিয়েছো···

জগুয়া এগিয়ে আসছে। হিংস্র জন্তু শিকারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বার আগে যে-ভঙ্গীতে এগিয়ে যায় তেমনি ভঙ্গী জগুয়ার। যোগেশের সঙ্গে তার দৃষ্টি বিনিময় হল। যোগেশ কি ইসারা করলে। মাথা নেড়ে জগুয়া উত্তর দিলে। সঙ্গে সঙ্গে চীৎকার উঠ্‌ল।

—মারো! মারো !!

হঠাৎ মার মার শব্দ শোনা গেল চারিদিকে। জগুয়ার দল বেপরোয়া ধাক্কাধাক্কি আরম্ভ করে দিয়েছে। মঞ্চের দিকে ধেয়ে আসছে তারা। ভয়াবহ বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হল।

—খবরদার। খবরদার।

পিছন থেকে টলতে টলতে সামনে এসে দাঁড়াল রামলাল। দাঁড়াল সুপ্রিয় আর প্রমীলাকে আড়াল ক'রে। দু'হাত প্রসারিত করে ভাঙ্গা গলায় জনতাকে উদ্দেশ করে বলে উঠ্‌ল—খবরদার।

রামলালকে দেখে ক্রুদ্ধ হুঙ্কার দিয়ে উঠ্‌ল জগুয়া। তার মাথার শিরে যেন ছিঁড়ে গেল। দু'চোখে তার খুন নেচে উঠ্‌ল। কোমর থেকে তীক্ষ্ণধার ছুরি টেনে বার করলে। তারপর সজোরে অব্যর্থ সন্ধানে সেই মারণাস্ত্র রামলালকে লক্ষ্য করে নিক্ষেপ করলে।

বায়ুস্তরের বুক চিরে বিদ্যুদ্দীপ্তির মতো দ্রুত ধাবমান সেই ছুরিকার ফলা রামলালের গলার নীচে বুকের মধ্যে গিয়ে বিঁধলো। অস্ফুট আর্তনাদ করে রামলাল লুটিয়ে পড়ল।

—খুন হো গিয়া। খুন! চারিদিকে বিষম বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হল। সেই মুহূর্তে সভায় ঢুক্‌লো পারেখ। সঙ্গে চারজন শাদা-পোষাক-পরা সশস্ত্র পুলিস।

পারেখ যদি মিনিট পাঁচেক আগেও আসতে পারতো!

গ্রেপ্তার হল জগুয়া সদলবলে, গ্রেপ্তার হল যোগেশ। নিমেষে যেন প্রলয় ঘটে গেল। কারুর মুখে রা নেই।

—রামলাল! এ কি হল রামলাল। এতক্ষণে কান্নায় ভেঙে পড়ল প্রমীলা। রামলালের পাশে বসে তার মাথাটা কোলে তুলে নলে।

ক্লান্ত-করুণ দুই চোখ মেলে বারেক তাকাল রামলাল, জড়িতস্বরে বললে—প্রমীলা! মা! আঃ!

রামলালের চেতনা লুপ্ত হল। সারা বুক রক্তে ভেসে যাচ্ছে। নিমীলিত দুই চোখে অশ্রুর আভাস।

—হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে। হিতেন এসো এদিকে। সুপ্রিয়র কণ্ঠস্বর নিজের কানেই বড় অদ্ভূত শোনালো। উত্তেজনায় তার সর্ব্বদেহ কাঁপছে।

লোকজন ছুটে এলো। ধরাধরি ক'রে রামলালের অচৈতন্য দেহ বাইরে নিয়ে গেল। তারপর কোম্পানীর মোটরে তুলে তাকে নিকটস্থ হাসপাতালে পাঠানো হল।

সুপ্রিয় হেঁকে বললে—হিতেন, তুমি সঙ্গে যাও। কোন চেষ্টার যেন ক্রটি না হয়। আমি এখনি যাচ্ছি।

পুলিস অফিসর সুপ্রিয়র সামনে এসে দাঁড়াল। বললে—আমার কর্ত্তব্য আমায় করতেই হবে।

সুপ্রিয় বললে—আমার যা বলবার আছে তা থানায় গিয়েই বলব।

ধৃত ব্যক্তিদের নিয়ে পুলিশ চলে গেল। পারেখ তাদের সঙ্গে রইল। লোকজন যে-যার ঘরের দিকে ছুটলো। জনশূন্য সভাস্থলে আবার দু'জনে দাঁড়ালো মুখোমুখি।

—আমার জন্যে প্রাণ দিলে রামলাল। গাঢ়স্বরে সুপ্রিয় বললে।

—আমার জন্যে! প্রমীলার কণ্ঠস্বর যেন বহুদূর থেকে ভেসে এল। দুই চোখে তার ক্লান্ত অর্থহীন শূন্য দৃষ্টি। সে যেন কেমনতর হ'য়ে গেছে। হাতের আঙ্গুলগুলো কাঁপছে। এখনি হয়ত প'ড়ে যাবে সে। তার পানে তাকিয়ে শঙ্কিত হল সুপ্রিয়। বললে—তুমি এবার বাড়ী ফিরে যাও।

ক্ষীণজড়িতস্বরে প্রমীলা বললে—ফেরবার পথ তো খোলা নেই। ফিরবো বলে তো আজ বেরুই নি।

চিন্তিত হল সুপ্রিয়—তাহলে এখন কি করা যায়?

উদাস কণ্ঠে প্রমীলা উত্তর দিলে—আমি জানি না। তুমি বলে দাও।

—আমি হস্‌পিটালে যাচ্ছি। তুমি যাবে?

—যাব বৈকি!

—চল।

* * * *

হাসপাতালের বড় ডাক্তার নিজে চিকিৎসায় লেগেছেন। ক্ষত স্থান বেঁধে দেওয়া হয়েছে। একাধিক ইনজেক্‌সন পড়েছে। স্বতন্ত্র কামরার শুভ্র শয্যার উপর রামলাল শুয়ে আছে, স্থির নিস্পন্দ।

মাথার শিয়রে গিয়ে বসল প্রমীলা। তার দুই চোখে জলের ধারা। রামলালের শেষ কথাগুলি তার কানে বাজছে।

ঘণ্টা খানেক পরে দু'জনে হাসপাতাল থেকে বেরুলো। ডাক্তার কোন আশা দিতে পারলেন না। বললেন, দু' তিনদিন যদি কাটে তাহলে হয়ত জীবনের আশা ফিরতে পারে।

নিস্তব্ধ জনহীন প্রান্তর পার হয়ে উভয়ে পথ অতিক্রম করতে লাগল। গভীর বিষাদে দু'জনেরই অন্তর আচ্ছন্ন মন্থর। কিছুক্ষণ কাটল নীরবে। তারপর সুপ্রিয় বললে—তাহলে শেষ মুহূর্ত্তে সভায় যেতে রামলাল তোমায় বলে পাঠিয়েছিল? ভাবতে আশ্চর্য্য লাগছে!

কেমন ক'রে সে বুঝলো যে তুমি কোন বাধা মানবে না, দুর্যোগ মাথায় করে বিপদের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়াবে ?

প্রমীলার মুখে কথা নেই। নানা সংঘাতের তীব্র প্রতিক্রিয়ায় সে যেন মুহ্যমান হয়ে পড়েছে।

সুপ্রিয় আবার বললে—রামলাল শুধু যে আমাকে বাঁচাল তাই নয়, তোমাকেও ফিরিয়ে দিল আমার কাছে।

প্রমীলা তথাপি নীরব। সুপ্রিয় বললে—কিছু বলছ না যে ? কি ভাবছ ?

কথা বলতে গিয়ে প্রমীলার কণ্ঠস্বর কম্পিত হল। বললে—বলবার কি আছে, বল! ভাবতেও পারছি না কিছু, বলতেও পারছি না। কেমন যেন অবশ লাগছে।

—অত্যন্ত উত্তেজনার পর এমনি অবসাদই আসে মনে। সুপ্রিয় বললে—আমি কি ভাবছি জান ?

—বল।

—ভাবছি, কত দুঃখের পথ পার হয়েই না তুমি আমার কাছে ফিরে এলে! শেষ পর্যন্ত যে এই ছিল তোমার মনে তা ভাবতে পারিনি।

দুই চোখ তুলে তার পানে তাকালো প্রমীলা, অস্ফুটকণ্ঠে বললে—ভাবতে পারোনি ?

—কেমন ক'রে পারবো বল ? ফিরিয়ে দিয়েছিলে। তারপর আবার যখন দেখা হল, তখন দেখলাম, তুমি পরের ঘরণী হ'তে চলেছো।

শিথিল কণ্ঠে প্রমীলা বললে—তা বটে। অপরাধের শেষ নেই

আমার। যা ভাবতেও গা শিউরে উঠ্ছে সে-কথা আর মনে করিয়ে দিও না। কিন্তু দেখলে তো, শেষ পর্য্যন্ত আমার তপশ্চর্য্যা ব্যর্থ হল না।

—তাই তো দেখলাম। শেষ জয় তোমারই।

মাথা নেড়ে করুণস্বরে প্রমীলা বললে—ওকথা বলো না। আমি তোমার কাছে হেরে গেছি। তোমার প্রেম আমার চেয়ে অনেক বড়। নিজের হাতে আমার সব অহঙ্কার আমি আজ অপার আনন্দে চূর্ণ করেছি।

•

প্রমীলার বাড়ীর সামনে এসে দু'জনে দাঁড়ালো। সুপ্রিয় বললে—যাও, এবার পিসিমার গঞ্জনা শোন গে। খড়্গহস্ত হয়ে আছেন তিনি।

প্রমীলা বললে—তাঁর খড়্গহস্তের চেয়ে খড়্গরসনাকে বেশী ভয় করি। বেশীদিন আমাকে এখানে বন্দিনী করে রেখো না, এই মিনতি।

হেসে বললে সুপ্রিয়—কপালে যে-ক'দিন দুর্ভোগ আছে সহ্য কর। যাব নাকি ভিতরে? 'জোড়ে' গিয়ে পিসিকে পেন্নাম ঠুকে আসবো নাকি?

মৃদুমধুর হাসি দেখা দিল প্রমীলার মুখে। বললে—বেআইনী আর সমাজ-বহির্ভূত হবে না সেটা? গাঁটছড়া না বেঁধেই 'জোড়ে' আসতে চাও!

মাথা নেড়ে সুপ্রিয় বললে—ঠিক। সময়কালে তোমার বুদ্ধি ছাড়া আমি অচল।

—সচল বিগ্রহ তুমি। আমি তোমার ছায়া মাত্র। স্নিগ্ধস্বরে প্রমীলা বললে।

সুপ্রিয় হেসে বললে—তাহলে বিগ্রহ ফিরে চললেন শূন্যমন্দিরে। ছায়াদেবী পিতৃগৃহে প্রবেশ করুন। ওই যে দ্বারদেশে ভৃত্য বুধনের দেখা পাওয়া যাচ্ছে। চলি তাহলে।

—এসো। কাল খুব সকালেই হাসপাতালে যাব। বেশী বেলা পর্য্যন্ত ঘুমিও না।

—সে বদ্-অভ্যেস কিছুকাল যাবৎ নেই। পরে আবার হবে কি না তা বলতে পারি নে।

—সে তখন দেখা যাবে। আর দাঁড়িয়ে থেকো না, ফেরো তুমি। মিষ্ট কণ্ঠে বললে প্রমীলা।

—তুমি যাওনা ভিতরে। তোমায় তো আটকে রাখিনি।

কণ্ঠস্বরে মাধুর্য্য ঝ'রে পড়ল এবার। ঈষৎ মাথা হেলিয়ে প্রমীলা বললে—বারে। তুমি দাঁড়িয়ে থাকবে বাইরে, আর আমি ভিতরে ঢুকে তোমার মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দেব, তা কেমন করে হয়।

—আচ্ছা, তাহলে এই অ্যাবাউট টার্ন্। হাত নাড়া দিয়ে বিদায় জানিয়ে সুপ্রিয় মাঠ পার হতে লাগল। যতক্ষণ তাকে দেখা যায় ততক্ষণ প্রমীলা তাকিয়ে রইল

* • *

সারাদিন সুপ্রিয় নানা ঝঞ্ঝাটে ব্যাপৃত রইল। আপিসে শৃঙ্খলার ব্যবস্থা, বারবার থানা-পুলিশ, রিপোর্ট লেখা আর এজাহার দেওয়া, এই করেই ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটল।

সকালেই হাসপাতালে গিয়েছিল সুপ্রিয়। গিয়ে দেখল, প্রমীলা তার আগেই গিয়েছে। বিষন্ন দুই চোখ মেলে সে রামলালের মাথার শিয়রে বসে আছে। রামলালের জ্ঞান তখনো ফেরেনি।

ঘণ্টাখানেক সেখানে থেকে সুপ্রিয় আপিসে [illegible] প্রমীলাকে বলে গেল, সন্ধ্যার পূর্ব্বেই সে আ[illegible] আসবে।

দুপুরে প্রমীলা বাড়ী ফিরলো। [illegible]াম নেই। কিন্তু সেদিকে মন [illegible]তে শরীর ভেঙে পড়ছিল। কি[illegible] প্রমীলা আবার হাসপাতালে উ[illegible]

সা[illegible]মীলা প্রশ্ন করল—এবেলা কেম[illegible]

মা[illegible]লেন—আর কোন আশা নেই। ডিলিরিয়ম[illegible]

ঘরে ঢু[illegible] প্রমীলা। তাকে দেখে নার্স ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

প্রলাপ বকছে রামলাল। প্রমীলা মাথার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। হঠাৎ সে ভীষণ চমকে উঠ্‌ল। এসব কি বলছে রামলাল?

—ছেড়ে দাও, কালিনাথ, আমায় ছেড়ে দাও। তুমি সয়তান! তুমি সয়তান!

প্রমীলার সর্ব্বদেহ হীম হোয়ে গেল। কার কণ্ঠস্বর? এ কার কণ্ঠস্বর সে শুনছে!

করুণ কণ্ঠের প্রলাপ শোনা যেতে লাগল—প্রমীলা, ওকে যেতে দিসনে মা, ধরে রাখ্, ওকে ধরে রাখ্। ভুল করেছি, ভুল করেছি। কিন্তু তার কি ক্ষমা নেই? ওরে, তোরা ছেড়ে গেলি আমায়, ভাসিয়ে দিয়ে গেলি, সয়তানের কবলে ফেলে দিয়ে গেলি আমায়...

কাঁপতে কাঁপতে রোগীর মাথার কাছে ব'সে পড়ল প্রমীলা। এ কি বিস্ময়! এ কি উদ্‌ঘাটন! এ কী মর্মান্তিক বেদনা!

অস্ফুটে প্রমীলা ডাকলে—জ্যেঠামশায়, জ্যেঠামশায়! এ কি হল! এ কি করলেন, জ্যেঠামশায়…।

কিন্তু তার ডাকে সাড়া দেবে কে? দীপ নিভে আসছে। ক্ষীণতর কণ্ঠের শেষ প্রলাপ শোনা গেল—আমায় তোরা শোধরাবার সুযোগ দিলি নে। সময় দিলি নে। শুধু আমার স্খলন আর ত্রুটিই তোদের চোখে পড়ল। ছেড়ে গেলি আমায়। আঃ, কালিনাথ। চুপ করো তুমি। আমি পাপিষ্ঠ? কিন্তু শুধুই পাপিষ্ঠ? ভাল কি কিছুই ছিল না আমার মধ্যে? কে? কে? কালিনাথ, আবার! দূর হও তুমি। ছেড়ে দাও আমায়, ছেড়ে দাও, আঃ...আঃ...

—জ্যেঠামশায়! প্রমীলা ঝুঁকে পড়ে ডাকলে—জ্যেঠামশায়।

রোগীর গলার ভিতর থেকে ঘড় ঘড় শব্দ নির্গত হল। দুই চোখ বিস্ফারিত হল মুহূর্তের জন্যে। তারপর ধীরে ধীরে মুদে এলো। নিথর হল দেহ। স্তব্ধ হল হৃদ্‌স্পন্দন।

—ডাক্তার বাবু! ডাক্তার বাবু! কেঁদে উঠল প্রমীলা।

সেই মুহূর্তে সুপ্রিয় ঘরে ঢুকলো। বললে—কি হল? তারপর এক পলকের দৃষ্টিপাতেই সে ব্যাপারটা বুঝে নিলে।

প্রমীলা লুটিয়ে পড়ল বিছানার উপর। চাপা কান্নায় তার সর্বদেহ আলোড়িত হোতে লাগল। তার সেই অধীর ব্যাকুলতার আতিশয্য দেখে একটু বিস্মিত হল সুপ্রিয়, পরক্ষণেই বুঝলে, তার জীবনরক্ষাকারীর জন্যে প্রমীলার এ আবেগ অস্বাভাবিক নয়। মাথা নুইয়ে, দু'হাত একত্রিত ক'রে, সুপ্রিয় মৃতের প্রতি তার শেষ শ্রদ্ধা এবং কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলে।

জানলার প্রান্তে আলোর শেষ রশ্মি মিলিয়ে যাচ্ছে। সূর্য্য অস্তে গেল।